

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা  
ক্লীবল্যান্ড ওহায়ো

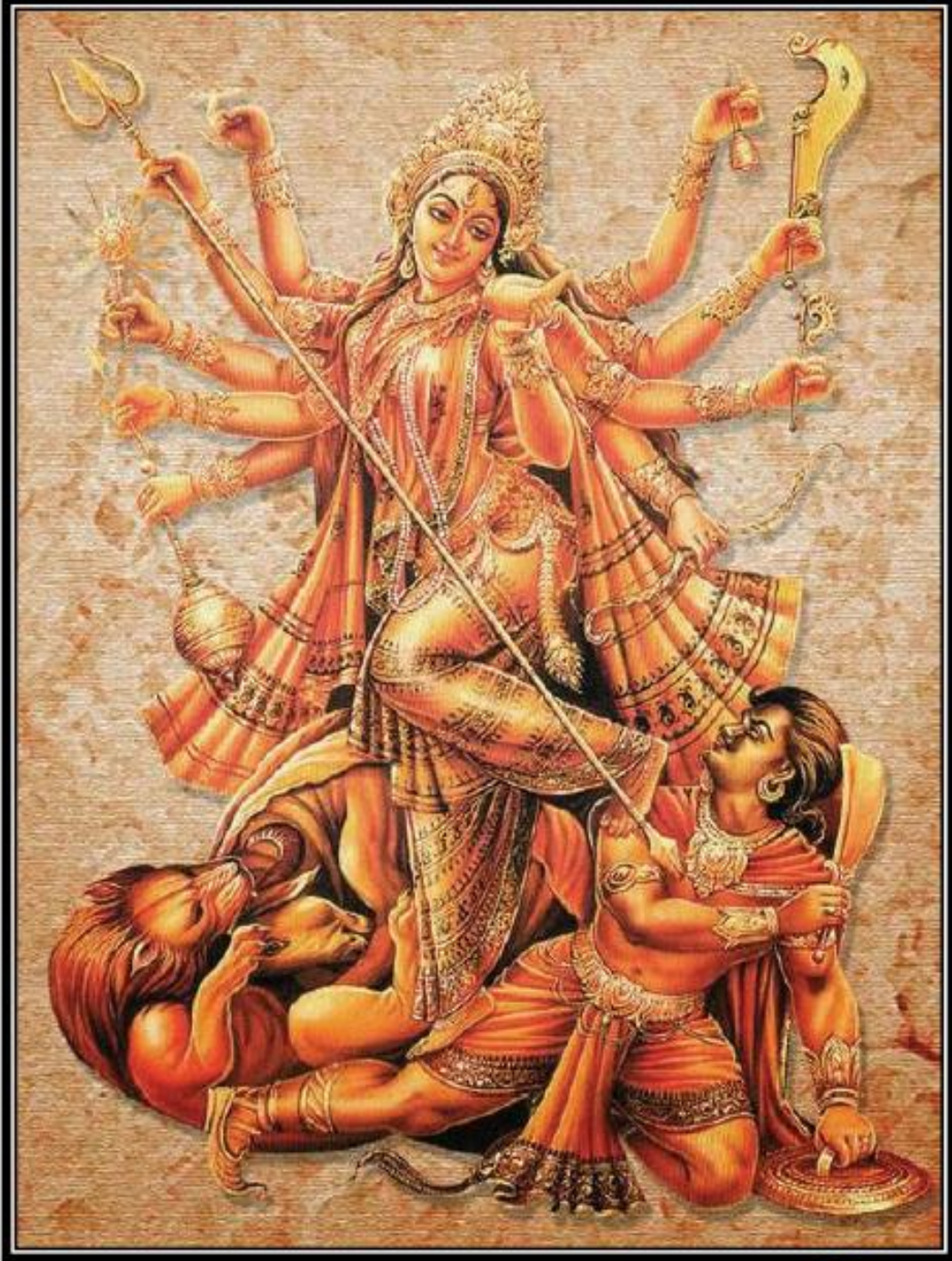


Bengali Cultural Society  
Cleveland Ohio

শারদাৰ্ঘ্য ২০১৯



শরণাগতদীনর্ত পরিত্রাণপরায়ণে ।  
সর্ববস্যাতিহরে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতে ॥



শুভা ও ব্রজেশ পাকড়াশী

শারদোৎসবের শুভেচ্ছাসহ ....



তৃণা, এ্যালিসা, প্রান্তিক, সমীরা

গোপাল ও শিপ্রা মাহা

# সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : রাজা পি কুমার

সম্পাদকীয় : 8

এক্সিকিউটিভ কমিটি : 13

ট্রেজারার রিপোর্ট : 14

পূজা নির্ঘন্ট : 16

পূজা সাব-কমিটি : 19

## গল্প ও বিশেষ রচনা

একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের অনুবাদ প্রয়াস - ব্রজেশ পাকড়াশী: 20

সঙ্গীতের বেদনা - শিপ্রা সাহা: 23

পুষ্পকরথ - স্বপ্না ব্যানার্জী : 28

ভূল শংসোধন - সুজয় দত্ত: 35

চুনোপুঁটি - পল্লব ভট্টাচার্য্য: 46

যোগ ও দুর্গোৎসব - অনিল বিশ্বাস: 47

মানুষ - অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়: 49

ডায়েরি : ১৯৮২ সাল - তিতাস মাহমুদ: 51

The year 2019 through the eyes of BCS Executive Committee - তানিয়া তালুকদার: 52

আমেরিকায় বাঙালিয়ানা - সুদেষ্ণা বিশী: 53

Robots for Medical Interventions and Treatments - তরুণ পোদ্দার: 55

Bong Connection - সিদ্ধান্ত সরকার: 64

Mystery Magic - রাজন্যা প্রামানিক: 65

He came, he saw, he conquered! - তানিয়া তালুকদার: 85

## রঙ্গিন কমিক্স

শুভজিৎ ব্যানার্জী : 84

## কবিতা

বিবর্তন - ড. আতিউর রহমান বুলবুল: 60

পাগলি আমার - বর্ষগজিৎ মজুমদার: 60

অসমাপ্ত - ব্রতী ভট্টাচার্য্য: 61

লক্ষী\* - পিনাকী রঞ্জন চক্রবর্তী: 61

বার্ষিকী - সুজয় দত্ত: 62

কবিতার আসাযাওয়া - সুজয় দত্ত: 62

An Ode to My Beloved Daughter- Pihu -

তানিয়া তালুকদার: 63

Durga Pujo - রাজন্যা বিশী: 68

## অঙ্কন

সীমা দাস :71

মধুমতী রায় বর্মণ: 72

অমিতাভ চৌধুরী: 73

রিয়ানা সেনগুপ্ত: 74

শৌর্য ভট্টাচার্য্য: 74

অনাভি বিশ্বাস: 75

সুমিত চক্রবর্তী: 75

অনহিতা চৌধুরী: 76

উপাসনা রায়: 76

আঁখি তালুকদার: 77

আর্যব মুখার্জী: 78

আর্যভ দাস: 79

রোহন ঘোষ: 80

আর্য ঘোষ: 81

অলিভিয়া ভট্টাচার্য্য: 82

ঋষভ দেব: 83



সংবলিত অনিন্দিত



অনিন্দিতা, শুভ, শ্রী, শৌর্য

# সম্পাদকীয়

গিরি, এবার আমার উমা এলে,  
আর উমা পাঠাবো না।  
বলে বলবে লোকে মন্দ,  
কারো কথা শুনবো না।।

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়,  
উমা নেবার কথা কয়—  
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া,  
জামাই বলে মানবো না।।

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়,  
এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,  
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,  
ঘরের ভাবনা ভাবে না।।

না, এবারে আমরা সত্যিই উমাকে ফিরে যেতে দেব না। ফিরে গেলেই তো সেই রোজকার 'খোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি খোড়' ... দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্রের তেরো নদী পার হওয়া মানুষগুলো, সব পাওয়া না-পাওয়ার গ্লানি অভিমান ভুলে শুধুই আনন্দশ্রোতে গা ভাসানো। আড্ডা হাসি হৈহৈ হুল্লোড় গান আর আশ মিটিয়ে মহাভোজে কয়েকটা দিন ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া।

বাংলার বর্ষা শেষের শরতের পেঁজা তুলোর মতো ভেসে বেড়ানো মেঘের দল, দেশের বার্তা নিয়ে আমাদের ক্লিভল্যান্ডে হাজির। উমা আসছে।

আসুন, আমরা সিংহবাহিনী, বরাভয় প্রদায়িনী রূপের আহ্বান করি সবে মিলে। তিনি শক্তিরূপিণী মহামায়া। আবার, বাঙ্গালীর কাছে দুর্গা শুধু দেবী নন, তিনি ঘরের কন্যাও। আমরা তাঁকে একেবারে ঘরের মেয়ে করে, তার আগমনীর আনন্দকে বাপ-মায়ের প্রাণ দিয়ে অনুভব করি, আবার তেমনই, বিজয়ার কন্যা-বিরহের বেদনায় কাতর হয়ে উঠি।

আমাদের ক্লিভল্যান্ডের 'বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা' এবছরে ৪১তম শ্রী শ্রী দুর্গা পূজার আয়োজন করছে, আগামী ৪ঠা থেকে ৬ই অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত। দেবীর বোধন থেকে দর্পণ বিসর্জন, সাজসজ্জার খুঁটিনাটি থেকে সিঁদুর খেলা, উৎসবের মঙ্গলদীপ জ্বালানো থেকে বিজয়ার বিষাদে, আবার আমরা জোট বাঁধবো সব্বাই মিলে, আনন্দে ভাসবো, ভালোবাসা মাখা কয়েকটা দিন আমাদের মায়ের সাথে কাটানো।

সবাইকে স্বাগত। বিগত বছর গুলোর মতো সকলের আন্তরিকতা আর বন্ধুত্বের বাড়ানো হাতের জোরেই আমাদের পথচলা। কৃতজ্ঞতা আর শুভেচ্ছা রইলো আগামীর উৎসবের দিনগুলোর জন্য। ক্ষমতা নয়, দম্ভ নয়, বাহুবল নয়, তার চেয়ে বড় মানুষের মঙ্গল কামনা, প্রকৃতির মঙ্গল কামনা, মানবতার যথার্থ মর্যাদা ... এই হোক আমাদের ধ্যানমন্ত্র।

শারদ শুভেচ্ছা রইলো,  
মায়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক সকলের পরিবারে।

কার্যনির্বাহী সমিতি, ২০১৯  
বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা  
ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র



# BEST WISHES AND BIJOYA GREETINGS



From our Family

Rohit, Mitali, Jayati & Ashis Rakhit



# Best Wishes and Puja Greetings



From:  
Rihan, Tithi and Tarun Podder



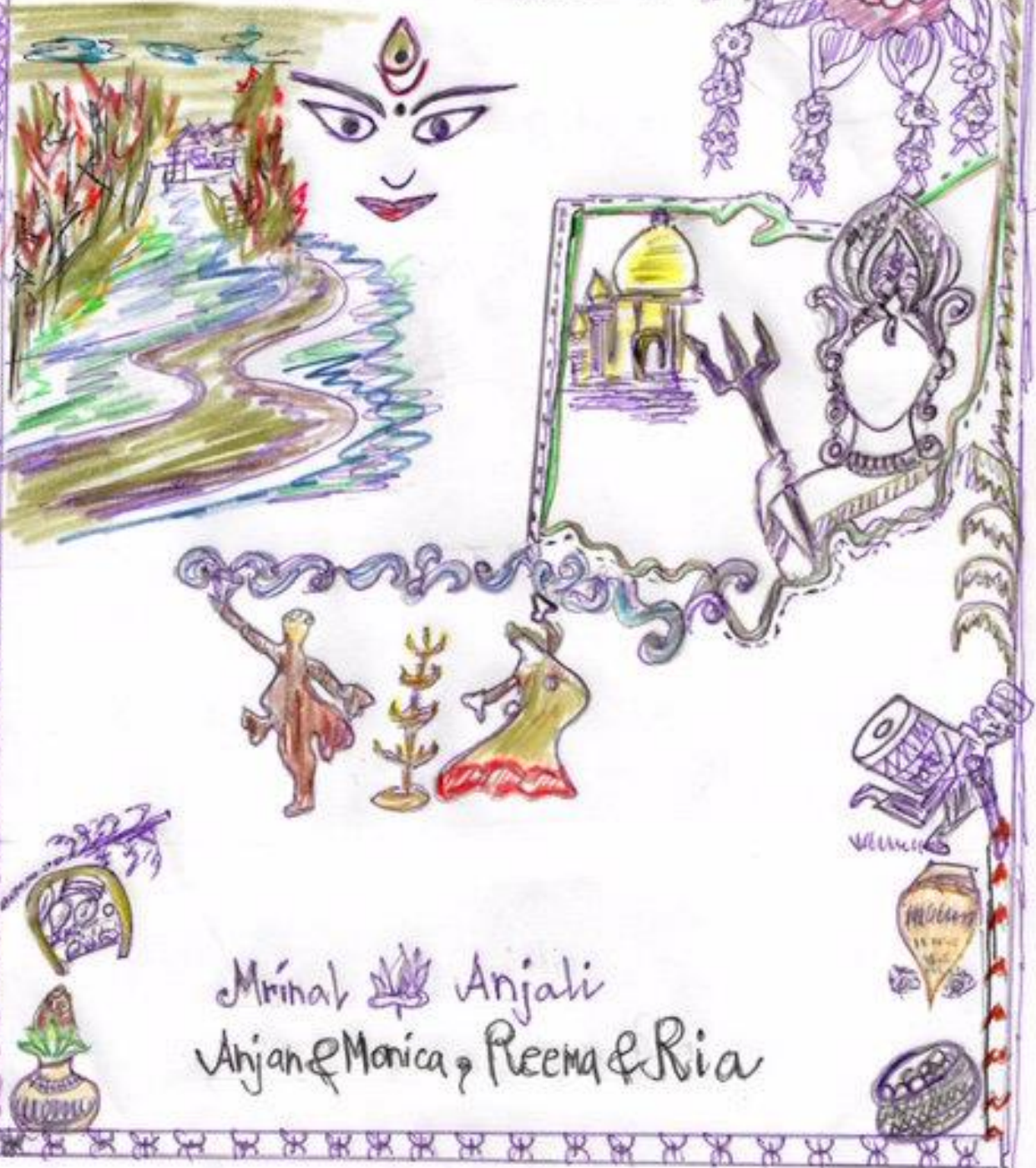
# Best Wishes & Puja Greetings



*From.....*

*Tamali and Soumya Chatterjee*

# শারদীয় অভিনয়



Mrinal Anjali  
Anjan & Monica, Reema & Ria



# Executive Committee 2019

<b>President</b>	Mitali Das Singh
<b>Vice Presidents</b>	Kingshuk Das Ananya Biswas
<b>Secretaries</b>	Taniya Talukdar Arunabha Kundu
<b>Treasurer</b>	Amiya Ghosh
<b>Cultural Secretaries</b>	Ambalika Das Gupta Soumyajit Paul Rupak Deb
<b>Youth Coordinators</b>	Adrik Dutta Siddhant Sarkar Yash Ghosh Ayan Nath
<b>Trustees</b>	Soumitra K Ghosh Bhaswati Bandyopadhyay Jaharul Haque

Our Website:  
[www.bcscle.org](http://www.bcscle.org)



Please visit our Facebook Page at Bengali Cultural society, Cleveland.

Our Mailing Address:  
32624 N. Roundhead Dr  
Solon, OH 44139

# ***BIJOYA GREETINGS...***

**DHARMINDER L. KAMPANI**  
**ATTORNEY-AT-LAW**



Key Bank Building  
17140 Lorain Avenue  
Cleveland, Ohio 44111  
Office: (216) 251-8023

# Puja Schedule

## Friday, 4<sup>th</sup> October 2019

7:00 PM: Puja  
7:30 PM: Prasad and Dinner for Kids  
8:00 PM: Kids' Cultural Program  
9:30 PM: Dinner for Adults

## Saturday, 5<sup>th</sup> October 2019

### Morning Schedule

10:00 AM: Morning Puja  
11:30 AM: Pushpanjali  
12 Noon: Prasad  
12:30 PM: Lunch for Kids  
1:00 PM: Lunch for Adults

### Evening Schedule

6:00 PM: Evening Puja and Arati  
6:30 PM: Dinner for Kids  
7:00 PM: Cultural Program by Members  
9:00 PM: Dinner for Adults

## Sunday, 6<sup>th</sup> October 2018

10:30 AM: Puja  
11:30 AM: Pushpanjali and Shantir Jol  
11:45 AM: Prasad and Dadhikarma  
12:00 Noon: Lunch for Kids  
12:15 PM: Baran and Sindur Khela  
1:30 PM: Lunch for Adults  
2:30 PM: General Body Meeting  
3:00 PM: Dhunuchi Naach

## Lakshmi Puja

Saturday, 12<sup>th</sup> October 2019  
6:00 PM: Puja and Panchali  
7:00 PM: Prasad  
7:15 PM: Dinner for kids  
7:30 PM: Cultural Program – Guest Artists  
9:30 PM: Dinner for adults

## শুক্রবার ৪ঠা অক্টোবর ২০১৯:

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা : পূজা  
সন্ধ্যা ৭:৩০ ঘটিকা : প্রসাদ বিতরণ ও ছোটদের নৈশ আহার  
সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা : ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান  
রাত্রি ৯:৩০ ঘটিকা : বড়দের নৈশ আহার

## শনিবার ৫ই অক্টোবর ২০১৯

### প্রাতঃকালীন নির্যন্ত

সকাল ১০ ঘটিকা : সকালের পূজা  
সকাল ১১:৩০ ঘটিকা : পুষ্পাঞ্জলি  
মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা : প্রসাদ বিতরণ  
দ্বিপ্রহর ১২:৩০ ঘটিকা : ছোটদের মধ্যাহ্নভোজ  
দ্বিপ্রহর ১টা ঘটিকা : বড়দের মধ্যাহ্নভোজ

### সন্ধ্যাকালীন নির্যন্ত

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা : সন্ধ্যা পূজা ও আরতি  
সন্ধ্যা ৬: ৩০ ঘটিকা : ছোটদের নৈশ আহার  
সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকা : স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান  
রাত্রি ৯:০০ ঘটিকা : বড়দের নৈশ আহার

## রবিবার ৬ই অক্টোবর ২০১৯

সকাল ১০:৩০ ঘটিকা : পূজা  
সকাল ১১:৩০ ঘটিকা : পুষ্পাঞ্জলি ও শান্তির জল  
সকাল ১১:৪৫ ঘটিকা : প্রসাদ বিতরণ ও দধিকর্মা  
মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা : ছোটদের মধ্যাহ্নভোজ  
দ্বিপ্রহর ১২:১৫ ঘটিকা : বরণ ও সিঁদুর খেলা  
দ্বিপ্রহর ১:৩০ ঘটিকা : বড়দের মধ্যাহ্নভোজ  
দ্বিপ্রহর ২:৩০ ঘটিকা : জেনারেল বডি মিটিং  
দ্বিপ্রহর ৩ ঘটিকা : ধুনুচি নৃত্য

## লক্ষীপূজা

### শনিবার ১২ই অক্টোবর ২০১৯

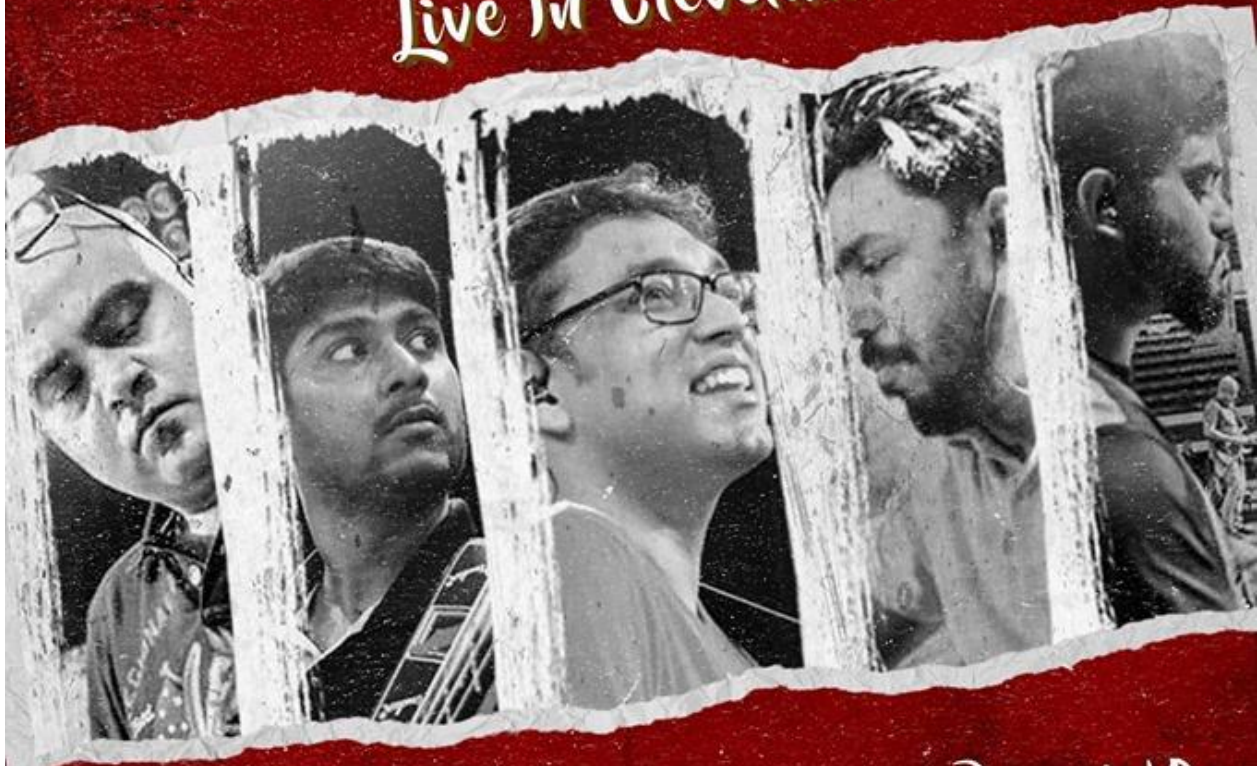
সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা : পূজা ও পাঁচালি  
সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা : প্রসাদ  
সন্ধ্যা ৭:১৫ ঘটিকা : ছোটদের নৈশ আহার  
সন্ধ্যা ৭:৩০ ঘটিকা : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - অতিথি শিল্পী  
রাত্রি ৯:৩০ ঘটিকা : বড়দের নৈশ আহার



BAIRD

# The Anupam Roy Band

## Live In Cleveland



Presented By  
**BENGALI CULTURAL SOCIETY**  
CLEVELAND, OH

**OCT  
11TH  
2019**

**Center For Performing Arts**  
5407 Turney Rd, Garfield Heights, OH 44125  
Dinner - 6:30 PM | Seating Opens - 7:30 PM

Tickets  
**\$50, \$75**

Sponsorships: Platinum \$1000 | Gold \$500 | Silver \$250

Visit [www.garfieldtheatre.org/bcs](http://www.garfieldtheatre.org/bcs) to book tickets online and grab early bird discounts

Use the code "earlybird8" to avail 15% off on tickets till August 15

Students can use "student25" to avail 25% off on tickets. Admission subject to providing valid Student ID

Free parking | Complimentary dinner included

For ticketing/sponsorship inquiries, call:

Amiya - 330 780 0248, Ambalika - 440 289 8283, Bikram - 330 631 5026, Mitali - 440 520 4638

[WWW.BCSCLE.ORG](http://WWW.BCSCLE.ORG)

# Puja Sub-Committee 2019

**Priests:**

Brojesh Pakrashi (Convener)  
Smarajit Bandyopadhyay Kaushik  
Ghoshal

**Puja Preparation:**

Anuradha Bhadra (Convener)  
Shyamasree Datta (Convener)  
Ambalika Das Gupta

**Bhog:**

Manjushree Banerjee (Convener)  
Sumitra Bhattacharyya  
Mukta Ghosh (Lakshmi Puja)  
Mitali Das Singh

**Protima Transportation:**

Ananya Biswas (Convener)  
Rupak Deb  
Arunabha Kundu  
Jayatu Das Sarma  
Sujit Sarkar  
Soumyajit Paul  
Kingshuk Das  
Amiya Ghosh  
Jaydip Das Gupta  
Bikram Roy  
Barsanjit Mazumdar

**Puja Mandap Decoration:**

Rupak Deb (Convener)  
Seema Das  
Ananya Biswas  
Rabisankar Talukdar  
Aankhee Talukdar  
Ananya Bhattacharya  
Soma Bhattacharya  
Arunabha Kundu  
Debjani Kundu  
Madhumanti Roy Barman  
Soumyajit Paul  
Punam Pramanik  
Jaydip Das Gupta

**Puja Prasad:**

Sudeshna Mitra (Convener)  
Sanchita Mal Sarkar  
Mahua Das Sarma  
Rajlakshmi Ghosh  
Somjita Sarkar  
Nilanjana Mazumdar  
Subhashri Ghosh  
Shyamasree Datta  
Taniya Talukdar  
Chumki Deb  
Debjani Kundu  
Puja Ghosh

**Dadhi Karma:**

Manjushree Banerjee (Convener)  
Shyamasree Datta  
Subhashri Ghosh  
Swapna Banerjee  
Rajlakshmi Ghosh  
Puja Ghosh

**Kitchen Management:**

Ananya Biswas (Convener)  
Mitali Das Singh  
Rajlakshmi Ghosh  
Amrita Nandi  
Chumki Deb  
Debjani Kundu  
Taniya Talukdar  
Soumitra Ghosh

**Khichuri Team:**

Jaharul Haque (Convener)  
Utpal Datta (Convener)  
Ranjan Dutta  
Ramen Majumdar  
Paritosh Chatterjee  
Niloy Bhadra  
Prabar Ghosh  
Jaydip Das Gupta  
Ananya Biswas

**Fundraising and Advertisement:**

Amiya Ghosh (Convener)  
Bikram Roy  
Bharati Majumdar  
Amrita Nandi  
Mitali Das Singh  
Soumyajit Paul  
Taniya Talukdar  
Prabar Ghosh  
Indrajit Mukherjee  
Ananya Biswas  
Sujay Dutta  
Jayatu Das Sarma  
Rajib Pramanik

**Brochure and Design:**

Amiya Ghosh (Convener, Editor)  
Raja P Kumar (Composer, Cover  
Design & Artworks)  
Amrita Nandi (Editor)  
Amitava Choudhury (Editor)  
Rajlakshmi Ghosh  
Soumyajit Paul

**Shopping:**

Mitali Das Singh  
Anil Singh  
Jaydip Das Gupta  
Utpal Datta  
Jayatu Das Sarma  
Rajlakshmi Ghosh  
Amiya Ghosh

**Lights & Sound:**

Ranjan Dutta  
Sujay Datta  
Soumen Bhattacharya  
Ananya Bhattacharya  
Rupak Deb

**Youth Coordinators:**

Adrik Dutta  
Siddhant Sarkar  
Yash Ghosh  
Ayan Nath

**Social Media & Communications:**

Taniya Talukdar (Convener)  
Kingshuk Das (Convener)  
Bikram Roy  
Soumyajit Paul  
Arunabha Kundu

**Cultural Program:**

Ambalika Das Gupta  
Soumyajit Paul  
Rupak Deb  
Pallab Bhattacharya  
Seema Das

# একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের অনুবাদ প্রয়াস

-ব্রজেশ পাকড়াশী

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং  
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।  
পতিং পতীনাং পরমং পরন্তাং  
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে  
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।  
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে  
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে  
ন চেশিতা নৈব তস্য লিঙ্গম্ ।  
স কারণং করণাধিপাধিপো  
ন চাস্য কশ্চিৎজনিতা ন চাধিপঃ ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা  
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।  
হৃদা মনীষা মনসাভিকলিপ্তো  
য এতদ্বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি ॥

- শ্বেতাস্বতর উপনিষদ ।

এই স্তোত্রটি যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত শ্বেতাস্বতর উপনিষদ থেকে উদ্ধৃত। জেনেছি প্রায় ১০৮ টি উপনিষদ রচিত হয়েছিল আনুমানিক ৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। বেদোত্তর যুগের এইসব গ্রন্থে রচিত ও আলোচিত হয় ভারতীয় দার্শনিক তথ্যের ভিত্তি ও বিবর্তন। মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয় জ্ঞান-গম্ভীর সুললিত ভাষা ও কাব্যিক ছন্দে যার অন্তর্স্পর্শী মাধুর্য্য এখনো সজীব।

- শ্বেতাস্বতর উপনিষদের রচয়িতা ছিলেন শ্বেতাস্বতর ঋষি। এই নামে তিনি খ্যাত ছিলেন কারণ কথিত আছে তিনি শ্বেত অশ্বতর অর্থাৎ খচ্চর বাহন নিয়ে চলাফেরা করতেন। এই উপনিষদটি সংক্ষিপ্ত এবং মাত্র ১১৩টি শ্লোকের সমষ্টিতে রচিত হলেও ১০৮টি উপনিষদ সংকলনের মাঝে বিদজ্জন সমাজে এক বিশেষ স্থান পেয়েছে।

এই গ্রন্থে ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে প্রার্থনা মন্ত্র রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রভাবিত ও মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সুর সংযোগে



"তমীশ্বরানাং পরমং..." ব্রহ্মসঙ্গীত নামে গীত হয় তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজে এবং ১৯২৯ সালে "আনন্দসঙ্গীতে" প্রকাশিত হয়।  
বহুবার শুনেছি এই প্রার্থনা সঙ্গীতটি। প্রতিবারই ভাল লেগেছে এবং মুগ্ধ হয়েছি সুরলালিত্যে, ভাবের গভীরতায় ও মন্ত্রগানের  
শব্দমাধুর্য্যে। কিন্তু স্তোত্রটির অর্থ ও বিন্যাস প্রকৃত হৃদয়ঙ্গম হয়নি কখনও। সম্প্রতি আমার প্রয়াত প্রিয় বন্ধু স্বর্গীয় বিজন রায়ের  
স্মরণ সভায় আমার অজ্ঞানতা আরও যেন বিশেষ ভাবে পীড়া দিল। বন্ধুবর শ্রী অমিয় ব্যানার্জী এই মন্ত্রগানটি পরিবেশন  
করলেন সুললিত কণ্ঠে ও ভাব-গম্ভীর অনুভূতিতে। সঙ্গীত সমাপ্তিতে বহুশ্রুত এই মন্ত্রগানে যেন নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেলাম।  
সম্ভবতঃ স্মৃতি ভারাক্রান্ত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু মানসিক ভাবে কিছু অতৃপ্তি রইলো স্তোত্রটির  
আংশিক দুর্বোধ্যতায়।

জিজ্ঞাসার তাড়নায় অশান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে "গুগলে" স্তোত্রটি উদ্ধার করলাম। অর্থ উদঘাটনে তখন একমাত্র  
সহায় আমার সীমিত সংস্কৃত জ্ঞান আর একটা Elementary Sanskrit to English Dictionary. স্থানবিশেষে শ্লোকগুলির  
সন্ধিবিচ্ছেদ করে আর অজানা সংস্কৃত শব্দের অর্থ সংযোগে অজ্ঞানতার মেঘটা যেন অনেকটা লাগবে হল। স্বচ্ছতার  
মুখোমুখিতে শ্লোকটির পরিবর্তিত রূপ দাঁড়ালো:

তম (তিনি) ঈশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম  
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাং (অতীন্দ্রিয়) বিদাম (জ্ঞাত হই)  
দেবং ভুবনেশমীড্যম্ (ঈড্যম্- আদরণীয়)  
য (যে) এতদ্ (ইহা) বিদুঃ (জ্ঞাত হন) অমৃতাঃ (অমরত্ব) তে (তিনি) ভবন্তি (প্রাপ্ত হন)  
ন তস্য (তঁহার) কার্যং করণং (দৈহিক অঙ্গ) চ বিদ্যতে (আছে)  
ন তৎসমঃ (তঁহার সমান) চ অভিঅধিকঃ চ দৃশ্যতে (দৃশ্যত অধিক গুণ সম্পন্ন)  
পরাস্য শক্তি (তঁহার অসীম ক্ষমতা) বিবিধ এর শ্রুয়তে (শোনা যায়)  
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।

ন তস্য কশ্চিৎ (কোনও কালে) পতি: অস্ত লোকে (জগতে)  
ন চ ঈশিতা (শাসন কর্তা) ন এবং তস্য লিঙ্গম (সূক্ষ্ম শরীর)  
স কারণ (তিনি সকল কারণের মূল) করণাধিপাধিপ (মনের নিয়ন্তা)  
ন চ অস্য কশ্চিৎ জনিত (পিতা) ন চ অধিপ (কর্তা)

এষ দেবো (এই দেবতা) বিশ্ব কর্মা মহাত্মা সদা জনানাং (জনগণের) হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট  
হৃদা (হৃদয়ে) মনীষা (মনন শক্তি দ্বারা) মনসা (কল্পনার প্রসারে)  
অভিকলিপ্ত (প্রকাশিত হল)

য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি।।

ব্যাকরণ ও শব্দার্থের জটাজাল থেকে উদ্ধার করা শ্লোকটি বাংলায় ভাবার্থ অনুবাদের অক্ষম প্রচেষ্টায় রাখলাম একটি  
সরল বাণীর বর্ণনাঃ-

অন্তরে স্থিত সেই মহেশ্বর যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর দেবতার দেবতা পতির পতি কল্পনার উর্দে অতীন্দ্রিয় আদরণীয় ভুবনেশ্বর। যাঁর  
মহিমার লব্ধ জ্ঞানে হয় অমরত্ব প্রাপ্তি। তাঁর কার্য্য নাই ইন্দ্রিয় নাই। কেহ নহে তাঁর সমতুল বা দৃশ্যত শ্রেষ্ঠ। স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর

জ্ঞানবলক্রিয়া। বেদশ্রুত ও খ্যাত তাঁর বিবিধ অপার শক্তির মহিমা। কোনও প্রভু নাই, নিয়ন্তা নাই, তাঁর এ ভুবনে। সূক্ষ্ম দেহেও তিনি চিহ্নিত নন। সকল কারণ ও আত্মার অধিপতি তিনি। তাঁর অধিপতি নাই। তিনি জনয়িতাহীন স্বয়ম্ভু। এই দেবতা মহাত্মা বিশ্বশ্রুতা বিশ্বব্যাপী পরমাত্মন। সর্বসৃষ্টজনের হৃদয়ে সতত: সন্নিবিষ্ট। তাঁহার প্রকাশ একমাত্র হৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শে, মননশক্তির গভীরতায় এবং মানসিক কল্পনার প্রসারে। যিনি এই সত্যে প্রতিভাত তিনিই অমরত্বের আশিস ধন্য।

বেদান্তের এই অসীম বিশ্বব্রহ্মান্ডব্যাপী, সর্বজীবস্থিত, সর্বশক্তিমান, নিরাকার ব্রাহ্মণের কল্পনা ব্রাহ্মদর্পণের মূল মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু কবিতা ও গানে এই তত্ত্ব নানারূপে প্রকাশ করেছেন।

এই মন্ত্রগানটির রবীন্দ্রসৃষ্ট উদাত্ত সুর মূল শ্লোকটির ঝংকারিত শব্দমাধুর্য্য ও অন্তর্নিহিত বাণীকে যেন আরও অলংকৃত করেছে। অভিভূত হতে হয় এই ভাবনায় যে, প্রায় তিন হাজার বছর আগে সভ্যতার উন্মেষের সেই প্রারম্ভের যুগে জীবনের উৎস, উদ্দেশ্য ও পরিণতির নিয়ন্তায় কোন শক্তি বর্তমান এই গভীর মূল তত্ত্বের চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করেছেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা। অপূর্ব ভাষায়, কাব্যে ও ছন্দে তাঁদের জ্ঞানগম্বীর সৃষ্টি আজও বিশেষ সজীব এবং সর্বকালের সর্বজনের হৃদয়মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত ও উদ্ভাসিত করবে।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কোপেনহাওয়ার উপনিষদের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "Glory and grandeur of Upanishads cannot be adequately described because words are finite and language is imperfect....this is production of highest human wisdom."

ওঁ শান্তি।।

**Biryani Hut**  
Authentic Indian Cuisine

DINE IN  
Take Out  
CATERING

(440) 471-4607

biryanihutcleveland@gmail.com

www.biryanihutexpress.com

26569 Center Ridge Rd, Westlake, OH 44145, USA



# সঙ্গীতের বেদনা

শিপ্রা সাহা

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে, সব মালপত্র আর একবার মিলিয়ে নিয়ে অরিন্দম এষার দিকে তাকিয়ে বললো, “এবার তাহলে আসি? আমি পৌঁছে ফোন করবো”। দশ বছরের ছেলে বাবু এগিয়ে এসে গর্বভরে বললো, “তুমি চিন্তা করো না বাপী, আমি মাকে ঠিক দেখে রাখবো”। “সেটা কি আমি জানি না”? ছেলের মাথায় হাত দিয়ে অরিন্দম বললো, “তোমার ভরসাতেই আমি নিশ্চিত মনে দু’সপ্তাহের এই ছোট্ট দরকারি ট্রিপটা নিতে পারছি”। আর কথা না বাড়িয়ে অরিন্দম রায় গগনচুম্বী অটোলিকার আটশো সাত-নম্বর ফ্ল্যাট থেকে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে ট্যাক্সির সামনে এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সি চালক যথারীতি জিনিসপত্র গাড়ীর ট্রাঞ্জে তুলে দিয়ে চালকের আসনে বসে জিজ্ঞেস করলেন, “কোন এয়ারপোর্টে যাবেন”? “ইন্দ্রিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট” বলেই অরিন্দম একটু নড়ে চড়ে বসলো। কেমন যেন অস্থির অস্থির বোধ হচ্ছে। আজ কুড়ি বছর ধরে এই ট্রিপের পরিকল্পনা চলেছিলো, শুধুমাত্র আর্থিক ও মানসিক দিকটা সামলাতেই এতো দেৱী হয়ে গেল। কুড়ি-বছরে জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিলো না। “স্যার, আপনি কি বাঙ্গালী? কলকাতা থেকে এসেছেন?” চালকের কথায় অরিন্দমের চিন্তাধারায় ছেদ পরলো। “হ্যাঁ, কেন বলুন তো?” “না, এমনি জিজ্ঞেস করছি, আমিও ঐ জায়গা থেকেই এসেছি”, পরিষ্কার বাংলায় চালক উত্তর দিলেন। “তাই না কি? তাহলে, আপনি তো এই ট্যাক্সি চালনার ব্যবসাসাটা কলকাতাতেই করতে পারতেন”? “হ্যাঁ, চেষ্টা করেছিলাম, কপালে লাগলো না” বলেই ট্যাক্সি চালক একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, আপনার কোন এয়ারলাইন্স, কখন ছাড়বে?” “এয়ার ইণ্ডিয়া, ফ্লাইট নম্বর ১০১, রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটে নয়াদিল্লীর ইন্দ্রিরা গান্ধী এয়ারপোর্ট থেকে গন্তব্য-স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে”। “কোন অসুবিধে নেই, আমরা সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে যাবো”। যাত্রীকে ভরসা দিয়ে চালক আবার গাড়ী চালনায় মন দিলেন। রাস্তাঘাটের কোলাহল বন্ধ হয়েছে, যানবাহনের সংখ্যাও কমে গেছে, দিনের শেষে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যে যার নিজের শান্তি কুটির বসে আহারপর্ব শেষ করে পরিবারের সঙ্গে মূল্যবান সময় কাটাচ্ছেন, পরের দিনের কাজের জন্য মনের প্রস্তুতি নিয়ে নিজেকে নিদ্রা-দেবীর কোলে সমর্পণ করছেন। ট্যাক্সি নয়াদিল্লীর রাজপথ দিয়ে দ্রুতগতিতে তার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। “কতো বছর ধরে এই রাজধানীতে আছেন?” চালকের প্রশ্নে অরিন্দমের ঝিমুনি বন্ধ হলো, “তা প্রায় এগারো বারো বছর হবে, আমি পশ্চিমবঙ্গের লোক, সরকারী চাকুরীর খাতিরে কলকাতা থেকে নয়াদিল্লীতে বদলি হয়ে এসেছি। কাজের ব্যাপারে অনেক সময় আমাকে দেশের বাইরেও যেতে হয়”। এটা যে তার কাজের ট্রিপ নয় তা অরিন্দম বলার প্রয়োজন মনে করলো না। “আচ্ছা, আপনার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে আপনি ওপার বাংলার লোক, তা এখানে এলেন কি করে?” অরিন্দমের প্রশ্নে চালক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “সে অনেক দুঃখের কথা স্যার, ঢাকার শহরতলীতে, একটি ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট কুটিরে, দুই বাচ্চা, স্ত্রী এবং মা ও বাবাকে নিয়ে সংসার ছিলো, খুবই সুখের সংসার, অপরিপূর্ণ কিছু ছিলো না, কুটিরের পাশে কিছু জমিজমা ছিলো, তার ওপর চাষ করে পরিবারের মুখে দুটো দানা-তুলে দিতে পেরেছি, ভালই চলছিলো, শহরের গণ্ডগোল আমাদের কোনদিনও স্পর্শ করতে পারেনি। তথাপি ভগবান বাধ সাধলেন। সত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হলো, এই আশংকার সংকেত গ্রামে-গঞ্জেও এসে পরলো। সবকিছু ভুলে নিরাপত্তার জন্য গ্রাম ছেড়ে দিয়ে পরিবার নিয়ে আমরা সকলেই এক অজানা পথে পাড়ি দিলাম। সে যাত্রার কথা ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। তারপর অনেক দুর্গম পথ পার হয়ে, অনেক ঘাটের জল খেয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছুলাম। নিরাপত্তা-তো পেলাম কিন্তু এখন খাবো কি? পরিবারকেও কি খাওয়াবো? পরিবার নিয়ে এই কষ্ট বহু বছর ধরে চলেছিলো। তারপর একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শে এই ট্যাক্সি চালনার কাজ আরম্ভ করেছি। তাই দিয়ে কোনমতে পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে পেরেছি। হঠাৎ চালক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, “স্যার, আমরা গন্তব্য-স্থলে এসে গেছি”। চালককে তার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে অরিন্দম মালপত্র নিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউন্টারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো।

প্লেনে বোর্ডিং শুরু হয়ে গেছে, লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অরিন্দম আর একবার পাসপোর্ট, ভিসা সব দেখে নিলো, অনেক লম্বা পথ যেতে হবে, নয়াদিল্লী থেকে নিউইয়র্ক ১৪ ঘন্টার যাত্রা। ছোট ব্যাগ ও সুটকেস নিয়ে অরিন্দম নিজের বসবার জায়গার সামনে এসে দাঁড়ালো, জিনিসপত্র মাথার ওপরে তুলে দিয়ে জানলার ধারে এসে বসলো। ক্লান্তিতে কখন দু’চোখের পাতা বুজে গেছে তা অরিন্দম নিজেই জানে না। ইতিমধ্যে এয়ার ইণ্ডিয়া বিকট গর্জন করে তার গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্য অন্ধকার আকাশে মিলিয়ে গেল।

\*\*\*\*\*

“ওরে গীতু, তুই কোথায়? গুরুজী এসেছেন, তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে নেমে আয়”, বাড়ীর ছোট-গিন্নী, পূর্ণিমা, ষোল বছরের মেয়ে গীতালীকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন, “আরে ও পদ্মার মা, ছাদ থেকে গীতুকে ডেকে নিয়ে এস তো, আর ছেলেটাই বা কোথায় গেল?” “দু’জনেই ছাদে ঘুড়ি

ওড়াচ্ছে”, গজ গজ করতে করতে পদ্মার মা ছাদের সিঁড়িতে পা দিলো। “এই যে তোমরা এই গরমে, পড়ন্ত রোদে, ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, মা যে এতো ডাকাডাকি করছেন তা কানে যাচ্ছে না? গুরুজী এসেছেন”। এক কথায় কাজ হয়ে গেল। ভাই বোনে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

“দেখি মা গীতালী, একবার ভূপালী রাগে তরানা খেয়াল শোনাও তো? গুরুজী আদেশ করলেন। তানপুরার ঝংকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছাত্তী ধরলো, “ধিম্ তা ধানা ধিম্ তানা ধিনা তা, তানা ধিম্ তানা তানা, ধিম্ তানা ধিম্ তানা”। গুরুজী চোখ বুজে তার ষোল বছরের ছাত্তীর সঙ্গীতের পারদর্শিতা দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। এই ছাত্তীকে কি শেখাবেন? ভগবান যে তাকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে গড়েই পাঠিয়েছেন। সুর সম্বন্ধে কিছু তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ করে গুরুজী সেদিনের মতো বিদায় নিলেন। যাবার আগে, ছাত্তীর মাকে বলে গেলেন, “মা, আপনি রত্নগর্ভা, আপনার মেয়ে একদিন সঙ্গীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করবে”। ছোটভাই, অরিন্দম, বাড়ীর সকলের অরু, দিদি অন্তঃ-প্রাণ, দিদির জন্য সে সব কিছু করতে পারে, দিদিও ভাই বলতে অজ্ঞান, দিদি তার জন্য কতো কি করে! বকুনি বা মার খাওয়ার সময় আগলে দাঁড়ায়, নিজের স্কুলের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে তার জন্য চকলেট নিয়ে আসে, আরও কতো কি! অবশ্য দিদির সব কথা মেনে চলতে হবে। একবার দিদি মাকে গিয়ে বললো, “আচ্ছা মা, অরু সব সময় আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে, আমি যেখানে যাবো, সেখানেই আঠার মতো লেগে থাকবে। ওকে একটা কিছুতে কাজে লাগাতে হবে। আচ্ছা মা, ওকে তবলা শেখালে কেমন হয়? তাহলে আমার গানের সঙ্গেও তবলা বাজাতে পারবে”। প্রস্তাবটা মন্দ নয়, ভাইবোনে দু’জনে একসঙ্গে সঙ্গত করতে পারবে। গুরুজীও এক মত হ’লেন। অতএব, অরিন্দমের তবলা চর্চা শুরু হলো। দিদি অনেক এগিয়ে আছে, তাকে ধরা সোজা কথা নয়, তারপর তবলার চাটিতে ভুল হলে দিদির হাতে চড়চাপড়ও খেতে হবে। অরিন্দমের এতো কিছু ভাবার মতো বয়স ছিলো না, সব কিছু ব্যাপারেই দিদি তার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা’হোক, সঙ্গীতচর্চা ও তবলা শিক্ষা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো। “বলি, বাড়ীটাকে একেবারে বাইজী বাড়ী করে তুলেছো? গান বাজনার আওয়াজে বাড়ীতে হরির নাম গুরুর নাম করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে”। কথাটা বড়-গিন্নী সরযু-বাবা, ছোট-গিন্নী পূর্ণিমার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিলেন। ওনার একটি ছেলে, বিয়ে করে বাড়ীতে বৌ এনেছেন, এখন নাতি-নাতনীর মুখ দেখবেন, এটাই ওনার কাছে স্বাভাবিক জীবন। \*\*\*\*\*

“স্যার, শুনছেন? আমি আপনাকে দু’বার ডেকেছি, আপনার রাতের খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে”, বিমান পরিচারিকার কথায় অরিন্দম ধড়মড় করে উঠে বসলো। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বিমান আটল্যান্টিকের ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে চলছে। একেবারেই স্কিডে নেই, একটু নাড়াচাড়া করেই খাবারের প্লেটটা পরিচারিকার হাতে দিয়ে দিলো। নিজের ঘড়িতে সময় দেখে বুঝলো ইঞ্জিনাতে এখন ভোর হয়েছে। বান্টুর স্কুলের সময় হয়েছে, স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, বাজারহাট করা সবই এষাকে একলা করতে হবে। এষা অবশ্য খুবই চটপটে, নিজেই অনেক কাজ সামলে নেয়। সরকারী কাজের চাপও বেশী, বছরে অনেক বার দেশের বাইরে যেতে হয়। এইবার ফিরে গিয়ে, বৌ ও ছেলেকে নিয়ে একবার টুরে যেতে হবে, ওরা অনেকদিন বাড়ীর বাইরে বেড়াতে যায় নি, ভাবতে ভাবতে অরিন্দমের চোখের পাতা বুজে এল। \*\*\*\*\*

সময় দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। রক্ষণশীল রায় পরিবারের একমাত্র কন্যা গীতালী রায় ওরফে গীতু স্কুল শেষ করে কলেজের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। অরুর এখনও কলেজে প্রবেশ করার সময় হয় নি, আরও দু’বছর বাকি আছে, তবে বাড়ীতে সঙ্গীত সাধনা ও তবলাচর্চা পুরোদমে চলছে। গুরুজীর তত্ত্বাবধানে গীতু সঙ্গীত সাধনে অনেক এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাড়ীর বাইরে গিয়ে বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনও করেছে। অবশ্যই বাড়ীর কর্তাদের অনুমতির জন্য গীতুকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। রায়বাড়ীর স্পষ্টবক্তা মেয়ে গীতু চীৎকার করে বলেছিলো, “তবে কেন আমাকে গানবাজনা শিখিয়েছিলো?, ওস্তাদ রেখে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনায় যুক্ত করেছিলো? কি ভেবেছিলো? বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে দুটো ভজন শুনিয়ে হাততালি পেলেই আমার জীবন ভরে যাবে?” তারপর থেকে সঙ্গীতের ব্যাপারে বাড়ীর আবহাওয়া অনেক পালটে গেছে। তবে, বড়কর্তা, গীতুর জ্যাঠামশাই, ভাইকে বুঝিয়ে বললেন, “শোন, নরেন, মেয়ে বড় হয়েছে, তার বিয়েসাদির ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করতে হবে বৈ কি”। অতএব বাড়ীতে ঘটকের আনাগোনা আরম্ভ হয়ে গেল। বাড়ীর বৌমার সহযোগিতায় গীতুকেও এরমধ্যে বিজড়িত করা হলো, ছবির আদান প্রদানও চললো। অবশেষে, বৌমা একটি বিশিষ্ট ছবি শ্বশুরমশাইয়ের হাতে দিয়ে বললো, “এই নিন বাবা, গীতুর পছন্দের ছবি”। দুই ভাই মিলে মুচকি হাসলো, “ওরে নরেন, বেঁচে গেছি, আমি তো আর একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম”। পাত্র কারুরই অপছন্দের নয়, এঞ্জিনীয়ার, সুপ্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে সিয়াটল, ওয়াশিংটনে থাকে, আমেরিকাতে প্রায় দশ বছর ধরে আছে। জমিদার রায়চৌধুরী বংশের ছেলে, দেখতে শুনতেও ভালো। আর কি চাই?

এরপরের ঘটনা খুবই তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চললো, পাত্রপাত্রী দেখা দু’বার করে হলো; পাত্র আসার আগে ও পরে, বিবাহের তারিখও নির্দিষ্ট হয়ে গেল। মাত্র তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে, পাত্র শোভন কুমার রায়চৌধুরী বিবাহ করতে কলকাতায় আসছেন। রায়বাড়ীর অন্দরমহল থেকে একটু বেসুরো কথা উঠেছিলো: “ওমা, সে কি কথা! বিয়ের বাজার করতেই তিন সপ্তাহ লেগে যাবে!” তবে বাড়ীর কর্তারাও থামিয়ে দিয়েছেন, “মেয়ের বিয়ে ব’লে কথা? সাধা

লক্ষী পায়ে ঠালা চলবে না”। পাত্র শোভন খুবই করিতকর্মা ছেলে, গীতালীর পাসপোর্ট ভিসার ব্যাপারেও যেসব কাজ আগে থেকে এগিয়ে রাখতে হবে, তার তালিকা দিয়ে চিঠি লিখে নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতএব বেশী কিছু চিন্তা করার আগেই, আমেরিকাবাসী এঞ্জিনীয়ার শোভন রায়চৌধুরীর সঙ্গে রায়পরিবারের একমাত্র কন্যা গীতালীর বিবাহ হয়ে গেল।

আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হলো দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের ঠিক পরেই, এবাড়ী ওবাড়ী করে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে দিদিকে নিয়ে জামাইবাবু আমেরিকাতে ফিরে গেছেন। সবাইকে আশ্বাস দিয়ে গেছেন, পরের বার এসে অনেকদিন থাকবেন। এবার একটু কাজের চাপ বেশী আছে। ছাদে উঠে অরু নীল আকাশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কেবলমাত্র একজন মানুষের অভাবে বাড়ীটা কি নিঃস্বস্ত হয়ে গেছে! তানপুরার তারের ঝংকার, ভোরবেলায় ভৈরৌ রাগে সুর সাধনা, আর তবলার সঙ্গে বিলম্বিত লয়ের খেয়াল -সব বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ মার ডাকাডাকিতে সম্বিত ফিরে এল। সত্যিইতো! স্কুলের সময় হয়ে গেছে।

সময় কারুর অপেক্ষায় বসে থাকে না। প্রায় দু’বছর হতে চললো গীতু চলে গেছে। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়, সেটাও খুব অল্প সময়ের জন্য, এদিকে অরিন্দমও তার হাইস্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরলো। \*\*\*\*

“স্যার, আপনার ব্রেকফাস্ট”, বিমান পরিচারিকা ট্রেটা এগিয়ে দিলেন। অরিন্দম ট্রেটা জায়গামতো রেখে, বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে ঠাণ্ডাজলের ঝাপটা দিয়ে, সিটে এসে বসলো। মাইকে পাইলটের ঘোষণা শোনা গেল, “আমরা দু’ঘন্টার মধ্যেই নিউইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবো”। \*\*\*\*\*

অবশেষে নয়াদিল্লী থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত ১৪ ঘন্টার যাত্রাও শেষ হলো। এয়ার ইণ্ডিয়া, ফ্লাইট নম্বর ১০১, নিউইয়র্ক সময় অনুযায়ী, সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিটে, কেনেডি এয়ারপোর্টে নিরাপদে ল্যাণ্ড করে তার আন্তর্জাতিক সফর শেষ করলো। কিন্তু অরিন্দমের যাত্রা সম্পূর্ণ শেষ হয় নি। তাই রীতিগত প্রথা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক যাত্রী হিসেবে সব বাহ্যিক নিয়ম পালন করার পরে মালপত্র নিয়ে অরিন্দম কেনেডি এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দাঁড়ালো। গন্তব্য-স্থলে যাওয়ার জন্য অরিন্দমকে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট, আমেরিকান এয়ারলাইন্স ধরতে বাসে করে লাগোড়িয়া এয়ারপোর্টে যেতে হবে। ক্লাস্তিতে দু’চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু কোন উপায় নেই। ঝিমোতে ঝিমোতে কখন যে মালপত্র নিয়ে বাসে করে লাগোড়িয়াতে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে এসে দাঁড়িয়েছে তা অরিন্দম নিজেই জানে না! সত্যি, এরকম করে চলাফেরা করা খুবই বেদনাদায়ক, অবিলম্বে এক কাপ গরম কফির দরকার। অগত্যা, মালপত্র সব চেক ইন করে, হাতে এক কাপ গরম কফি নিয়ে, অরিন্দম আমেরিকান এয়ারলাইন্সের গেটে এসে চেয়ারে বসে পরলো। যাক, বাঁচা গেল, হাতে দু’ঘন্টা সময় আছে, একটু বিশ্রাম নেওয়া যাবে। এখান থেকে প্লেন বেলা ২টা ৩৭ মিনিটে ছেড়ে গন্তব্যস্থলে সন্ধ্যে ৬টা ৫৮ মিনিটে পৌঁছুবে। উল্টো দিকের ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে আল্টি ডিনার সেরে অরিন্দম আবার জায়গা মতো ফিরে এল।

আমেরিকান এয়ারলাইন্স দ্রুতগতিতে তার গন্তব্য-স্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্লেনের পরিচারিকা সবাইকে জলখাবার পরিবেশন করছেন। অরিন্দমের ক্ষিদে নেই, তাই নিজেকে নিদ্রাদেবীর কোলে সমর্পণ করে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত হলো। কতোক্ষণ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলো তা অরিন্দম জানে না। হঠাৎ পরিচারিকার কথায় ঘুম ভেঙ্গে গেল - কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেন ল্যাণ্ড করবে। চার ঘন্টার ফ্লাইট এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল! মাইক্রোফোনে পাইলটের গলা শোনা, “আমরা, নিউ অর্লিন্স লুই আর্মস্ট্রং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামছি”। প্লেন গেটে আসার পরে, সকলেই জিনিসপত্র নিয়ে সোজা ব্যাগেজ ক্লেমের জায়গায় চলে গেল। অরিন্দমও তাদের অনুসরণ করে, নিজের সুটকেস ও ব্যাগ নিয়ে বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালো। একেবারে দেশের মতো আবহাওয়া। চাকরীর খাতিরে বেশ কয়েকবার আমেরিকা আসার সুযোগ হয়েছে, তবে সে সফর এ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। অবশ্যই এটা তার চাকরীর ট্রিপ নয়। ইতিমধ্যে, একটি ট্যাক্সি এসে অরিন্দমের সামনে থামলো। ট্যাক্সি চালক সাউদার্ন একসেন্টে ইংলিশে জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় যাবেন?” “বুরবন অর্লিন্স হোটেল, ফ্রেন্স কোয়ার্টার্স”, অরিন্দম উত্তর দিল। ট্যাক্সি চালক হেসে বললেন, “বেশী দূরে নয়, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব”। অতএব, মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে অরিন্দমের মনে হলো সে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। ছোটবেলায় বইতে পড়েছিলো, নিউ অর্লিন্স শহর আমেরিকার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে লুসিয়ানা স্টেটে মিসিসিপি নদীর ধারে অবস্থিত। অবশেষে ট্যাক্সি ফ্রেন্স কোয়ার্টার্সে এসে, নির্ধারিত হোটেলের সামনে থামলো। ফ্রন্ট ডেস্কে দাঁড়িয়ে হোটেলের কাগজপত্র সই করে অরিন্দম নিজের ঘরে এসে বিছানায় বসে পড়লো। এর মধ্যে হোটেল বেয়ারাও তার মালপত্র এনে ঘর গুছিয়ে, ‘গুড নাইট স্যার’ বলে চলে গেল। অরিন্দমও নিজেকে নিদ্রাদেবীর কোলে সমর্পণ করে ক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিলো।



পরের দিন, হোটেল পরিচারিকাদের করিডোর দিয়ে আনাগোনার শব্দে অরিন্দমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকাল আটটা বাজে, ওরে বাবা! অনেক বেলা হয়ে গেছে। প্রায় বারো ঘণ্টা টানা ঘুমিয়েছে। এ ঘুমটার অবশ্যই দরকার ছিলো। হাতমুখ ধুয়ে, জামাকাপড় বদলে, হোটেলের কাফেটেরিয়াতে ব্রেকফাস্ট শেষ করে, অরিন্দম একেবারে ফ্রন্ট ডেস্কে এসে দাঁড়ালো। “গুড মর্নিং স্যার, সব কিছু ঠিক আছে?” হোটেল ক্লার্ক জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যাঁ, কোন অসুবিধে নেই”, অরিন্দম হেসে জবাব দিলো। “আমি আপনার জন্য কি করতে পারি স্যার?” ডেস্ক ক্লার্ক আবার প্রশ্ন করলেন। অরিন্দম পকেট থেকে ঠিকানাসহ কিছু কাগজপত্র বার করে দেখালো এবং তার সঙ্গে গাড়ী চালনার ইণ্ডিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্সের কার্ডটাও দেখালো। “তিরিশ মিনিটের মধ্যেই আপনার সবকিছু রেডি হয়ে যাবে”, ডেস্ক ক্লার্ক ভরসা দিয়ে বললেন। অতএব, গাড়ীর চাবি, নিউ অর্লিন্স শহরের ম্যাপ এবং ছোট কাগজে লিখিত কয়েকটি বিশিষ্ট জায়গার পথনির্দেশ নিয়ে অরিন্দম বাইরে এসে গাড়ীতে উঠলো। আর একবার দরকারী কাগজপত্র, বিভিন্ন জায়গার ঠিকানা ইত্যাদি ভালো করে গুছিয়ে নিয়ে অরিন্দম গাড়ীতে স্টার্ট দিলো। কিছুক্ষণ মিসিসিপি নদীর ধার দিয়ে ড্রাইভ করে, অরিন্দম শহরের ভেতরে ঢুকে একটি চার্চের সামনে এসে গাড়ী থামালো। চার্চের উল্টোদিকে লাইন করে ছোট ছোট বাড়ী আছে, এমনকি কিছু নতুন টাউনহাউস ও এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংও দেখা যাচ্ছে। হোটেলের ক্লার্কের নির্দেশ অনুযায়ী ঠিকানাটা মিলিয়ে নিলো, মনে হয় ঠিক জায়গাতেই এসেছে। এতো বছর বাদে, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আছে তো? নিজেকেই প্রশ্নটা করে, কলকাতার ছেলে অরিন্দম চৌধুরী ঘামতে শুরু করলো। নাঃ, এভাবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। গাড়ী থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে, উল্টো দিকের বাড়ীর ঠিকানাগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেল, হ্যাঁ, এই বাড়ীটাই হবে। কাগজে লিখিত ঠিকানার সঙ্গে দুবার করে মিলিয়ে নিলো। কলিংবেলে হাত দিয়ে আবার কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে রইলো, অরিন্দম কি নিজের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলছে? না,না, এতোটা দূরে এসে সব ভুল্ল করলে চলবে না। শেষপর্যন্ত তিন বার কলিংবেল টেপার পরে, এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন, পরনে লং গাউন, চুল কাঁধ পর্যন্ত ছোট করে কাটা ও চোখে ভারী চশমা, নরম গলায় সাউদার্ন একসেন্টে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি? আপনি কার খোঁজ করছেন?” “মিস্ হেনরিয়েটা কি এই বাড়ীতে থাকেন?” অরিন্দম কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো। “আমিই মিস্ হেনরিয়েটা, আপনি কে?” অরিন্দমের মনে হলো তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, শক্ত করে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বললো, “তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না দিদি? চিনবেই বা কি করে! কুড়ি বছর আগের অরু আর বর্তমান অরিন্দমের মধ্যে চেহারার অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু মনের কোন পরিবর্তন হয় নি। সেই জন্যই আজ তোমার দরজায় এসে হাজির হয়েছি” বলেই দিদির অজ্ঞান অবস্থায় পড়ন্ত দেহটা ধরে ফেললো, তাড়াতাড়ি করে ভেতরে ঢুকে লম্বা সোফাতে শুইয়ে দিলো, সামনে টেবিলের ওপর এক গ্লাস জল ছিলো, চোখে মুখে কিছুটা জল ছিটিয়ে দিলো। তারপর? এখন কি করবে অরিন্দম? যদি সময়ে জ্ঞান না ফেরে, তবে কি কাছের কোন হাসপাতালে নিয়ে যাবে? মনে হচ্ছে, দিদি এখানে সকলের কাছেই পরিচিত। হয়তো পাশের বাড়ীর নেবারের সঙ্গে একটু কথা বলে ব্যবস্থা করা দরকার, অরিন্দম বাইরে যাবার জন্য দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, “তোকে কোথাও যেতে হবে না অরু, আমি ঠিক আছি” বলেই দিদি সোফাতে উঠে বসলো। এরপর থেকেই ভাইবোনের স্মৃতিরোমন্বন শুরু হলো।:

অরিন্দমই আগে শুরু করলো। জানিস দিদি, তুই চলে যাবার পর বাড়ীটা একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমার তবলা বাজানোও বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন জ্যাঠামশাই সবাইকে ডেকে বললেন, “তোমরা সবাই এরকম চুপ মেরে গেলে কেন? কি হয়েছে? মেয়ের ভালো বিয়ে হয়েছে, ভালো আছে ও সুখে আছে, সেটাই তো সবচেয়ে বড় কথা, যাও, যে যার কাজকর্ম শুরু করে দাও”। তারপর থেকে ধীরে ধীরে বাড়ীর আবহাওয়া অনেকটা স্বাভাবিক হলো। আমরা সবাই তোর চিঠির বা ফোনকলের জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম। এই করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, কেটে গেল। তোর ছেলে হল, ছেলেও চার বছরের হয়ে গেল। অবশেষে ছেলে নিয়ে তুই একা তিন সপ্তাহের জন্য দেশে এসেছিলি। জামাইবাবুর কাজের চাপের জন্য ছুটি নেওয়া সম্ভব হয় নি। বাড়ীর সবাই তোকে আরও দু’সপ্তাহ থেকে যেতে বলেছিলো, তুই রাজী হোস নি। কারণ, জামাইবাবু নিজের পরিবার নিয়ে নিউ অর্লিন্স বেড়াতে যাবার জন্য আগে থেকেই টিকিট বুক করে রেখেছেন। অতএব, তুই নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে যাবার পরে, আমরাও যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পরলাম। তোর চিঠি লেখা বা ফোন করাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ীর সবাই বললেন, “বিদেশের বাড়ীতে একলা হাতে বাচ্চা মানুষ করা কি চাট্টিখানি কথা? চিঠি লেখা বা কথা বলার সময় কোথায়? বাড়ীর অন্দরমহলের কথাটা সকলের কাছেই যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হলো। তারপরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল, আমিও কলেজের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছি, পড়া ও পরীক্ষা নিয়ে খুবই ব্যস্ত, কিন্তু চৌধুরী পরিবারের একমাত্র কন্যার কথা কেউ ভুলেও আলোচনা করে না। কেন? কিসের জন্য? কাউকে জিজ্ঞেস করলে, সকলেই এড়িয়ে যায়। কেন? কি করেছিস দিদি? কেন এমন হোল দিদি? বলতে বলতে অরিন্দম বাচ্চা ছেলের মতো ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। শান্ত হ অরু, শান্ত হ বলে, গীতালী ওরফে মিস্ হেনরিয়েটা অরু চোখের জল মুছিয়ে দিলো। “একটু ধৈর্য ধর, বিশ্রাম কর, এতো দূর থেকে এসেছিস! উত্তেজিত হোস না, অসুস্থ হয়ে পরবি। তোকে আমি সব কথা বলবো। \*\*\*\*\*”

ছেলের হাত ধরে তোর জামাইবাবুর সঙ্গে নিউ অর্লিন্স বেড়াতে এসেছিলাম। শহরটি বেশ ছিমছাম, ভালই লেগেছিলো। একদিন ফ্র্যাঙ্ক কোয়ার্টার দিয়ে হাটতে হাটতে একটা ছোট ‘পাব’ এর সামনে এসে দাঁড়লাম। ভেতরে এক ভদ্রলোক, ক্ল্যারেনেটে জ্যাজ মিউজিক বাজাচ্ছেন। উনি এখানে সবার কাছে পাপা চার্লস নামে পরিচিত, একজন সুপ্রতিষ্ঠিত জ্যাজ মিউজিকের সঙ্গীত শিক্ষক ও সঙ্গীত সৃষ্টিকর। বাজনা বন্ধ করে, ভদ্রলোক আমাদের ভেতরে গিয়ে বসবার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি কিছু বলার আগেই তোর জামাইবাবু বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ, আমরা ভিজিটর, আমাদের সময় খুবই কম”। ‘পাব’ থেকে বেরিয়ে, আর একটু এদিক ওদিক ঘুরে হোটেলে ফিরে গেলাম। আমার কানে তখনও জ্যাজ মিউজিক বেজে চলেছে। পরের দিন, ভোরবেলায় উঠে ফাস্টের পরে, নিউ অর্লিন্সের আর একটা দিক পরিদর্শন করতে গেলাম। আমি যন্ত্রের মতো বাবা ও ছেলের পেছনে পেছনে সব জায়গা ঘুরে বেড়ালাম। হোটেলে ফিরে তোর জামাইবাবু বললেন, “কাল থেকে তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে না, তোমার নিজের পছন্দ মতো জায়গা পরিদর্শন করতে পার”। বুঝলাম ওটা রাগের কথা, কিন্তু সেই বোধশক্তিও আমি হারিয়ে ফেলেছি। পরের দিন ওরা বেরিয়ে যাবার পরে, আমি আবার পাবে গিয়ে চেয়ারে বসে চোখ বুজে, ক্ল্যারেনেটে জ্যাজ মিউজিক শুনতে লাগলাম এবং সেই মিউজিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কখন যে আমার গলা দিয়ে, ভীমপলশ্রী রাগে তরানা খেয়াল বেরিয়ে এলো, তা আমি নিজেই জানি না, “দির দির দা নি, ও দে দা নি ……………”। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, পাপা চার্লস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, “তুমি কোথা থেকে এসেছো মাই চাইল্ড? ইউ হ্যাভ এ ওয়াণ্ডারফুল ভয়েস, মে গড ব্লেস ইউ!” হোটেলে ফিরে দেখি ছেলে নিয়ে তোর জামাইবাবুও ফিরেছেন, বুঝলাম ওরা বাইরে থেকে ডিনার সেরে এসেছে। আমিও কোন উচ্চবাচ্য না করে সোজা শুয়ে পরলাম। জীবনে জটিলতার শেষ নেই।

পরের দিন একটু বেলা করে উঠলাম, রাতে ভালো ঘুম হয় নি। যথারীতি, বাবা ও ছেলে বেরিয়ে গেছে। আমিও পাবে গিয়ে মিউজিক শুনে, পাপা চার্লসের সঙ্গে মিউজিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে হোটেলে ফিরে গেলাম। এদিকে সিয়াটলে ফেরার সময়ও হয়ে গেল। ফেরার দিনও একটু দেরী করে ঘুম থেকে উঠলাম, বিকালের ফ্লাইট ছিলো, মনে হয় বাবা ও ছেলে হোটেলের কাফেতে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছে। আমি সুটকেস গুছিয়ে জামাকাপড় পরে রেডি হয়ে নিলাম। ওরা এতো দেরী করছে কেন বুঝতে পারলাম না। বেলা ১টা বেজে গেল, এখন বেরোতে না পারলে প্লেন মিস করবো, ভাবতে ভাবতে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো, বুঝলাম বাবা ও ছেলে আর্লি ফ্লাইট নিয়ে সিয়াটল ফিরে গেছে। টাকা পয়সা ও প্লেনের টিকিট সবই তোর জামাইবাবুর কাছে ছিল। আমি দিশেহারা হয়ে সুটকেস নিয়ে পাবে গিয়ে পাপা চার্লসকে সব কথা খুলে বললাম। শুনে বললেন, “ডেন্ট ক্রাই মাই চাইল্ড, এপ্রিথিং উড বি ফাইন”। উনি আমাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ওনার স্ত্রী মাম্মা ক্যাথারিন আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। অনেক চেষ্টা করেও তোর জামাইবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না। পরে বুঝতে পারলাম যে সিয়াটল ছেড়ে উনি অন্যত্র চলে গেছেন। আমি দিশেহারা হয়ে পাগলের মতো কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম। খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মাম্মা ক্যাথারিন খুবই চিন্তিত হয়ে পরলেন। পাপা চার্লস বললেন “ওকে কাদতে দাও, ও যে সঙ্গীতের থেকেও অনেক বড় সম্পদ হারিয়েছে”। অবশেষে কান্নাকাটিও থামলো, আমিও উঠে দাঁড়লাম। তারপর থেকে পাপা চার্লসের ক্ল্যারেনেটের সঙ্গে জ্যাজ মিউজিক শিখতে শুরু করলাম। জ্যাজ মিউজিকের সঙ্গে ভারতীয় তরানা মিশ্রিত করে এক নতুন সঙ্গীত তৈরী হলো। গত পনের-ষোল বছর ধরে এই মিশ্রিত মিউজিক পরিবেশন করে জনসাধারণকে আমরা অনেক আনন্দ দিয়েছি। \*\*\*\*\*

অরিন্দম ফিরে গেছে, আর ছুটি বাড়ানো সম্ভব ছিলো না, যাবার সময় ভরসা দিয়ে গেছে যে ফিরে গিয়ে দিদির পাসপোর্ট ও ভিসার বন্দোবস্ত করে দিদিকে দেশে নিয়ে যাবে। মনে মনে হাসলো গীতালী ওরফে মিস্ হেনরিয়েটা।

তারপর সোফা থেকে উঠে পাপা চার্লস ও মাম্মা ক্যাথারিনের ছবির সামনে এসে দাঁড়ালো। নিঃসন্তান সাউথ এমেরিকান দম্পতি তাকে পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। ছবির দিকে তাকিয়ে বিভ্রিভ করে বললো, “অরু বোঝে না, আমি কি করে তোমাদের ফেলে যাবো বলতো?” মিস্ হেনরিয়েটার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল, চোখ বুজে শুনতে পেলো, “ক্যারি দা টর্চ মাই চাইল্ড, সেইভ আওয়ার মিউজিক”।

\*\*\*

# পুষ্পকরখ

স্বপ্না ব্যানার্জী

আজকাল ইংরেজিতে bucket list বলে একটা কথা খুব চল হয়েছে। যেহেতু কথাটা এসেছে মৃত্যুর অপভাষা "kicking the bucket" থেকে, আমার কাছে কথাটা খুবই depressing মনে হয়। তার থেকে বরং শখের ফর্দ বা স্বপ্নের ফর্দ বলাটা অনেক বেশী বাস্তবীয়। আমার স্বপ্নের ফর্দ এখনও অনেক লম্বা। ছোটবেলায় ভ্রমণকাহিনী পড়ার প্রচণ্ড নেশা ছিল বলে এই ফর্দে পৃথিবীর অনেক জায়গার নাম আছে। তবে শুধু নতুন জায়গা দেখার শখই নয়, আমার অনেক কিছু করারও ইচ্ছে আছে, যার অনেকগুলোকেই আমার কর্তা বলেন উদ্ভট শখ। এই দলের মধ্যে পড়ে আমার বহুদিনের hot air balloon এ চাপার শখ। আমার ছেলেরা সে ইচ্ছেটার কথা জানতে পেরে দশবারো বছর আগে আমাদের anniversary তে উপহার দিয়েছিল একটি packaged deal – দুরাত্রি এক fancy hotel এ রাত কাটানো ও সেই সঙ্গে Pennsylvania র এক scenic hot air balloon ride. আমার কর্তার সে শখ ছিল না, তবে anniversary তে তো আর আমাকে একা পাঠানো যায় না, তাই বাধ্য হয়েই আমার সঙ্গে যেতে হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, আমি সে balloon ride টা খুবই উপভোগ করেছিলাম। ওপরে যখন উঠলাম তখন মনে হচ্ছিল আমি এক স্বপ্নরাজ্যে ডানা ছড়ানো পাখির মত অনায়াসে ভেসে যাচ্ছি – কোনও শব্দ নেই, বাঁকানি নেই, অপূর্ব এক শান্তিময় অনুভূতি। তবে মাঝে মাঝে আমাদের pilot যখন বেলুনের burner গুলো চালিয়ে দিচ্ছিল তখন সেটা প্রচণ্ড হিস্ হিস্ আওয়াজ করছিল এবং আগুনটা ঠিক মাথার ওপরে ছিল বলে মনে হচ্ছিল গরমে আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত সব পুড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের jacket গুলো খুলে ভাই দিয়ে মাথাটা ঢেকে রেখেছিলাম।

বাই হোক, আমার বেলুনে ওঠার শখ পূর্ণ হবার পর আবার ওঠার কোনও plan ছিল না, কিন্তু গত মার্চ মাসে আমরা যখন Turkey বেড়াতে যাবার plan করলাম তখন আমার সেই ইচ্ছে আবার নতুন করে জেগে উঠল। এর আগেও একবার Turkey তে গিয়ে অসুস্থতার দরুণ কিছু না দেখেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম, কিন্তু তখনই resereach করে জেনেছিলাম যে Turkey র Anatolia region এ Cappadocia অঞ্চলের hot air balloon ride নাকি জগদ্ বিখ্যাত। বলাই বাহুল্য এবার ভাই আমি সেই সুযোগ ছাড়তে রাজি হলাম না।

ভারী সুন্দর দেশ এই Turkey, অতি স্বচ্ছল এবং উন্নত দেশ – ওদের রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর ইত্যাদি আমেরিকা থেকে কোনও অংশে কম যায় না। এশিয়া এবং ইয়োরোপ এই দুই continent কে ছুঁয়ে থাকা এই দেশটির সংস্কৃতিতেও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রভাব সশেষতীত ভাবে চোখে পড়ে। তবে আজ আমি সে আলোচনায় না গিয়ে শুধুমাত্র আমার কাপাডোকিয়া balloon ride এর অভিজ্ঞতার কথাই লিখতে বসেছি। Turkey র Goreme Valley অঞ্চলে Cappadocia উপত্যকাকে ঘিরে রয়েছে Mount Hasan এবং Mount Erciyes পর্বতমালা। এই অঞ্চল বিখ্যাত এখানকার unusual rock formation এর জন্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এখানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে যে ছাই জমে তা পরবর্তীকালে বহু শতাব্দী ধরে শক্ত হয়ে একধরনের নরম sandstone এর মত পাথরে পরিবর্তিত হয়, যার নাম হচ্ছে tuff. ছাইয়ের ওপরে lava পড়ে একটা শক্ত basalt এর layer তৈরী হয়। তার পরে বহু বছর ধরে এ অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়াতে ধীরে ধীরে নরম পাথরের অনেক অংশই ক্ষয়ে যায়, কিন্তু ওপরের নিরেট, শক্ত অংশগুলো অক্ষত অবস্থায় রয়ে যায়। এর ফলে এই অঞ্চলে পাথরের স্তূপ সব বিচিত্র আকার ধারণ করেছে। এগুলোর উচ্চতা ১৩০' পর্যন্ত পৌঁছায়। এই সব অনন্য পাথরের স্থাপত্যে শুধু যে প্রকৃতির অবদান আছে তাই নয়, এতে মানুষের হাতও আছে। চতুর্থ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের প্রতিকূল আবহাওয়া এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের হাত থেকে বাঁচাতে নরম পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে মৌমাছির চাকের মতন খোপ খোপ বাড়ী তৈরী করে। চতুর্থ শতাব্দীতে Christian রা রোমের নির্ধাতন থেকে বাঁচতে এখানে পালিয়ে আসে এবং এই পাহাড়ের গায়ে গর্ত খুঁড়ে নিজেদের church ও monastery তৈরী করে। শুধুমাত্র low flying balloon থেকে এই সব কিছু একসঙ্গে ভাল করে দেখা যায়। ছোটবেলায় আমি কখনও Cappadocia র নাম শুনিনি, কিন্তু এখন জেনেছি যে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে অভিনব দ্রষ্টব্য স্থলদের মধ্যে অন্যতম।

আমরা যে tour group এর সঙ্গে Turkey গিয়েছিলাম এটি তাদের একটি optional tour. এর ticket এর দাম খুব বেশী। তাছাড়াও অনেকেই বেলুনে উঠতে ভয় পায়। তাই আমাদের দল থেকে মাত্র কয়েকজন যাবে শুনলাম। আমরা Istanbul থেকে Nevsehir (নতুন শহর?) নামে একটি ছোট জায়গায় রাত কাটানাম। এদের এই সব balloon flight এর খুব কড়া নিয়মকানুন, তাই এরা শেষ মুহুর্তে জানায় weather বেলুন ওড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট ভাল কিনা। রাত সাড়ে তিনটের সময় আমরা ঘুম থেকে উঠে তৈরী হলাম। বাইরে বেলুন কোম্পানির বাস অপেক্ষা করছিল। আমাদের দল



থেকে খুব কম লোক গেলেও এই বাস আরও অনেক হোটেল থেকে লোক তুলতে তুলতে গেল। Starting point এর কাছাকাছি এসে এরা আমাদের একটি ছোট café তে breakfast খাওয়াতে নিয়ে গেল। ঘুম ভাঙতে coffee র দরকার ছিল সকলেরই। সেখান থেকে আমরা একটা খোলা মাঠের মত উঁচু নীচু জায়গায় গেলাম। তখনও বেশ অন্ধকার। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম এক অবাস্তব দৃশ্য। আমাদের চতুর্দিকে অন্ধকারে সারি সারি টিপি়র মতন কিছু বস্তু উঁচু হয়ে আছে দেখলাম। সেগুলোর থেকে মাঝে মাঝে ভুস্ ভাস্ করে একটা গর্জন হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। মনে হল সারি সারি fire breathing dragon রা কাৎ হয়ে পড়ে আছে। আমাদের ওরই একটা টিপি়র কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তিনচারজন লোক দেখলাম সেই আগুনের direction guide করার চেষ্টা করছে। একটা বিরাট বুদ্ধি side হয়ে পড়ে আছে এবং আগুনের আলোর একটি রংচংএ চুপসে যাওয়া বেলুনের আকার দেখা যাচ্ছে।



আস্তে আস্তে সেই আগুনের হলকার গরম হওয়া বেলুনের ভেতরে ঢুকতে সেটা ফুলতে শুরু করল এবং উঠে দাঁড়াতে লাগল। সেই টানে তার সঙ্গে আটকানো বুদ্ধিটিও ধীরে ধীরে সোজা হল। বুদ্ধিটির চারদিকে চারটে খোপে চারজন করে লোক দাঁড়াতে পারে এবং মাঝখানে একটু বড় জায়গায় pilot এবং বেলুন চালাবার যন্ত্রপাতি থাকে। মুশ্কিল হল যে এই বুদ্ধিটি আমার বুক পর্যন্ত উঁচু এবং তাতে ওঠার কোন ব্যবস্থা নেই। একটা ফুটো আছে মাঝামাঝি জায়গায় – আমি তাতে পা দিয়ে

ওঠার  
চেষ্টা  
করেও



কিছু সুবিধে করে উঠতে পারলাম না। নীচ থেকে তুর্কী ভাষায় বহু instructions, encouragement ইত্যাদি আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ওদের দুজন লোক আমার পশ্চাৎদেশে একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে তুলে দিল। আমি সেখানে বুদ্ধির কানায় Humpty Dumpty র মত পা ঝুলিয়ে বসে আবিষ্কার করলাম যে ভেতরেও নামার কোনও ব্যবস্থা নেই। কর্তা আগে উঠেছিলেন। তিনি তখন আমাকে



টানাটানি করতে লাগলেন এবং আমিও হাঁচড় পাঁচড় করতে করতে একসময় বলের মত গড়িয়ে ধুপ করে ভেতরে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস তখনও অন্ধকার! অবশ্য পরে দেখলাম আরও অনেকেরই সেই এক অবস্থা।

বেলুন  
বতফণে  
ওপরে  
উঠতে



শুরু করল ততক্ষণে একটু একটু করে ভোর হতে শুরু করেছে। আমি খুব খুশী হয়ে আবিষ্কার করলাম যে এই বেলুনটিতে burner গুলোর নীচে একটি screen লাগানো আছে, সুতরাং গরমটা মাথায় লাগে না। আমাদের pilot খুব আমুদে লোক। সে আমাদের নানা রকমের রসিকতা শোনাতে শোনাতে নিয়ে চলল। নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেলাম। আধো





অন্ধকারে মনে হল বরফে ঢাকা ছোট ছোট jagged edged পাহাড় ছড়িয়ে আছে। বিরাট উপত্যকার চারিদিক ঘিরে আছে পাহাড়। একদিকে শহর, রাস্তা, ও বাড়ীঘর। মনে হল আমরা তাদের ছাত ছুঁয়ে যাচ্ছি। একটু একটু আলো হয়ে গেলেও তখনও আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃশ্য হচ্ছে চারিদিকে ঘীরে ঘীরে এক



এক করে আরও অনেক বেলুন উঠতে শুরু করেছে। তাদের burner এর আগুন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে এবং তার আলোর তখন তাদের বেলুনের সব চমকপ্রদ রংগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। চারিদিকে যেন অগ্নিস্তম্ভ ফানুস উড়ছে। ঘীরে ঘীরে পূর্বাকাশে আলো হতে শুরু করল। আমাদের pilot বেলুনটিকে পুরো ৩৬০° ঘুরিয়ে দিল একবার যাতে আমরা সবাই সূর্যোদয় দেখতে পাই। আমি আমার

দুচোখ ভরে এই স্বর্গীয় শোভা উপভোগ করতে করতে ভাবলাম একেই বোধহয় বলে স্বর্গের সিঁড়ি – আমি ঘীরে ঘীরে স্বর্গে উঠে যাচ্ছি।



আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচের formation গুলো পরিষ্কার দেখা

যেতে আরম্ভ করল। এর মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে Fairy Chimney



গুলো – একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু কিছু খাড়া towers – তাদের নীচের অংশগুলো হওয়াতে ফয়ে সফ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওপরে শক্ত পাথর টুপির মতন লেগে আছে। এগুলোকে তাই mushroom rock ও বলা হয়। আরও রয়েছে Imagination Valley, যেখানে প্রতিটি পাথরের আলাদা আকার – কোনটা

জন্তুর মত দেখতে, কোনটা আলিঙ্গন বদ্ধ প্রেমিক প্রেমিকার মতন, আবার কোনটা একটি বাচ্চা মেয়ের মত – যে বার নিজের কল্পনার মত করে ভাবতে পারে, তাই তার নাম Imagination Valley. Monk's Valley



তে দেখা যাচ্ছে Early Christianity র চিহ্ন – church, monastery ইত্যাদি। এগুলোতে এখন আর কেউ থাকে না, কিন্তু এর



ভেতরগুলো খুব ভালভাবে সংরক্ষিত। ভেতরের Fresco painting গুলো খুব বিখ্যাত। Pigeon houses – পাথরের গায়ে পায়রার খোপের মত ছোট ছোট দরজা জানালা দেখা যাচ্ছে – তার ভেতরের বাড়ীতে লোক থাকে। এছাড়া আছে Cave houses – পাথরের নীচে সুরঙ্গ করে বাড়ী। এখানে এখনও লোকজন থাকে। ক্ষেত খামারও আছে। আমাদের pilot বেলুনটি খুব নীচে নিয়ে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাচ্চাকে হাত নেড়ে দিয়ে বলল এটি তার ছেলে এবং এটাই তার বাড়ী। এইসব pilot দেয় খুব rigorous training দেওয়া হয়। প্রায় শতাব্দেক বেলুন একসঙ্গে উড়ছে, মাঝে মাঝে বেলুনগুলো নীচে নেমে গিয়ে একেবারে প্রায় বাড়ীর ছাত ছুঁয়ে যাচ্ছে, নীচের লোকদের সঙ্গে কথা বলছে, অথচ কেউ কারোর সঙ্গে ধাক্কা লাগাচ্ছে না।



ভোরের আধো অন্ধকারে যে পাথরগুলোকে সাদা বরফে ঢাকা মনে হচ্ছিল সেগুলো ধীরে ধীরে সূর্যের ছটায় সোনার রং ধরল।



অনেকক্ষণ ধরে চন্দ্র ও সূর্যকে আমরা এক আকাশে দেখতে পেলাম। এক ঘণ্টা ধরে আমরা হাওয়ায় ভেসে ভেসে চারিদিকের এই অসাধারণ সৌন্দর্য উপভোগ করলাম।



এর পরে নামার পালা। ভাবলাম ধূপ করে নামব – একটা ধাক্কা লাগবে, বা সিনেমাতে যেমন দেখা যায় – একটা গাছের ডালে আটকে বুলে থাকব। কিন্তু প্রথম কথা এই অঞ্চলে বড় গাছ তেমন নেই, আর দ্বিতীয় কথা এদের pilot দের অসাধারণ দক্ষতা। দেখলাম একটা সাদা pickup truck ধুলো উড়িয়ে খুব জোরে আমাদের দিকে আসছে। তার পেছনে একটা লম্বা trailer লাগানো। আমাদের pilot একটা weighted মোটা দড়ি নীচে ছুঁড়ে দিল। Truck থেকে নেমে তিনজন সেই দড়ি ধরে বুলে পড়ল। বেলুন তাদের টেনে হিচড়ে সঙ্গে নিয়ে চলল কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। কিছুতেই দড়ি ছাড়ল না। তাদের টানাটানিতে এবং pilot এর অভাবনীয় দক্ষতার জোরে আমাদের বেলুনের বুড়ি



একবারে তাক করে সেই trailer এর ওপরে নামানো হল। এত precision আমি এর আগে কখনও দেখি নি। বেলুন চূপসে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল আবার, ওরা সেটাকে গুটিয়ে বুড়িতে ঢোকাতে শুরু করল। তার আগে অবশ্য বুড়ি খালি করতে সেই ওঠার সময়ের মতন ধাক্কাধাক্কি, টানাটানি, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবকিছুই আবার reverse order এ ঘটল। দুর্ভাগ্যবশত এবার আর অন্ধকার ছিল না আর আমার pilot এর মত সেই precision না থাকায় ঠিক মতন নামতে পারলাম না – হাত পা ছুঁড়ে গেল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই

একই দৃশ্য – বহু pickup truck দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের কর্মীরা দড়ি থেকে বুলছে।



নীচে আমাদের জন্য champagne, cookie ইত্যাদি অপেক্ষা করছিল। আগেরবারও মনে আছে ride এর পর champagne দিয়েছিল। এর কারণটা Google দাদার থেকে



জ্ঞানতে পারলাম। ১৭৮০ র দশকে France এ hot air balloon প্রথম আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়। তখন কেবলমাত্র aristocrat দেরই এতে ওঠার সামর্থ্য ছিল। অনেকসময় তাদের বেলুন ক্ষেত খামারে নেমে গরীব কৃষকদের ফসল নষ্ট করত। তারা তখন pitchfork নিয়ে তেড়ে আসত। তাদের ঠান্ডা করতে তখন এই aristocrat রা নিজেদের picnic basket থেকে champagne বার করে এদের দিতেন। আজও তাই সব balloon ride এর পরে সেই tradition

বজায় রাখা হয়। আমি অবশ্য ও রসে বাঞ্ছিত, তবে খুব ভাল cookie খেতে খেতে আমি মনে মনে ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম আমাকে এই অপূর্ব অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়েছেন বলে।



অভয়া শক্তি বলপ্রদায়িনী তুমি জাগো



শারদীয়ার হার্দিক শুভেচ্ছাসহ

সুজাতা মিত্র,

সন্ধ্যা, লক্ষীনারায়ণ, দেবলীনা,

সুদেষ্কা, দেবব্রত ঘোষ

মাতৃমন্দির পূন্যঅঙ্গন কর মহোজ্জ্বল...

Seasons Greetings to all our  
friends in the community



*Rakesh, Ravi, Rimi,  
David, Arjun, Anita, Lily,  
Aria, Sipra & Amiya  
Banerjee*



**Bijoya Greetings and Warm Wishes to all**

**Dr. Atul & Shuva Mehta**

50 Stonewood Drive, Moreland Hills, Ohio 44022





# ভুল শংসোধন

সুজয় দত্ত

কী মনে হচ্ছে এ-লেখার শিরোনামটা দেখে? এই পত্রিকার অন্যত্র যা যা ছাপার ভুল-টুল আছে তার তালিকা? নাকি আমি অতীতে যতরকম ভুলভ্রান্তি করেছি সেগুলো নিয়ে অনুতাপ-পরিতাপের তেলে চুপচুপে করে ভাজা আর নস্টালজিয়ার চিনির রসে ডোবানো করুণ কাহিনী? কিংবা হয়তো মানুষ তার নশ্বর জীবনে যেসব বৈঠক কাজকর্ম করে বা বেচাল চালে সে-বিষয়ে লম্বা গুরুগম্ভীর লেকচার আর একগাদা অযাচিত উপদেশ? নাঃ, হলো না, ডাহা ফেলা। একেবারে গোপ্লা। এবং এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনি আর যাই হন, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের খাতা দেখা বাংলার মাস্টারমশাই (বা দিদিমণি) নন। তা যদি হতেন, ওপরের ঐ শিরোনামে যে দুখানা জলজ্যাস্ত বানান ভুল রয়েছে সেদুটো আপনার "লাল পেন্সিল" চোখে প্রথমেই নজরে পড়তো আর বুঝতে পারতেন এ-লেখার আসল বিষয়বস্তু ভুল বানান।

হ্যাঁ, ভুল বানান। কী বলছেন, আপনার ওসব হয় না? ছি ছি, মিথ্যে বললে আবার চিত্রগুপ্তের খাতায় লাল দাগ পড়বে যে! অবশ্য জানিনা চিত্রগুপ্ত আজকাল লাল পেন্সিল ব্যবহার করে, না তার ল্যাপটপের ওয়ার্ড প্রসেসরের অটোমেটিক হাইলাইটার। যাইহোক, পৃথিবীতে যেমন একটাও মানুষ নেই যে হামাগুড়ি থেকে হাঁটতে শেখার সময় একবারও আছাড় খায় নি বা বয়ঃসন্ধিতে বিপরীত লিঙ্গের কারোর দিকে একবারও আড়চোখে তাকায় নি, তেমনি একটা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ খুঁজে দিন তো আমায় দেখি, যে জীবনে বানান ভুল করেনি? নগদ পঞ্চাশ টাকা বাজী রেখে বলতে পারি (সরি, আমার পকেটে ওর বেশী থাকে না) যে পারবেন না। ওঃ, বুকেছি কিসের ভরসায় আপনার এতো দেমাক। দরজা-বাবুর সূক্ষ্মকোমল জানালার "স্পেলচেকার" আর চাকরি-বাবুর আপেলমার্কা চালাকচতুর চলভাষের "অটো-কারেক্ট" -- তাই তো? কী বলছি বোঝা গেলো না বোধহয়? আরে বাবা, Bill Gates-এর Microsoft Windows আর Steve Jobs-এর Apple smart phone-এর কথা হচ্ছে। তা ওসব তো ইংরেজী বানানের জন্য। যারা জন্মাবার পর মুখে মাতৃভাষা ফোটায় আগেই কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার উৎপাতে যাদের বানানজ্ঞানের সাড়ে-বারোটা বেজে গেছে, তাদের যাতে ভুল বানানের জন্য বেইজ্ঞত হতে না হয় -- দরজা-বাবু আর চাকরি-বাবু তাই এসব ব্যবস্থা করেছেন। ওতে আমার-আপনার, মানে ইলিশ আর রসগোল্লার দেশের লোকেরদের কী উপকারটা হলো? বরং ঝামেলা আরো বেড়ে গেলো। ইমেলের বা হোয়াটসঅ্যাপ-এ "বাংলিশ" (অর্থাৎ ইংরেজী হরফে বাংলা) লিখতে গিয়ে নিত্য নাকানিচোবানি খায় যারা, তাদের

নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না সমস্যাটা। এইতো সেদিন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ পেলাম "Pepsi Coke Lemon Dakota Pine" | আমি মর্মেদ্বন্দ্ব করতে হিমশিম খাচ্ছি, এমন সময় সে ফেসটাইম ভিডিওফোনে বললো আসলে লিখতে চেয়েছে "পিসি চোখে তেমন দেখতে পায়না"। এ তো তাও নিরীহ ব্যাপার। শুনেছি আমার এক বন্ধুর বন্ধু একবার দারুণ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো "অটোকারেক্ট"-এর এই বয়োভাপনার জন্য (সত্যি মিথ্যে জানি না)। তাদের পাড়ায় প্রতি শনিবার আবর্জনা আর রিসাইক্লিং-এর জিনিসপত্র নিতে গাড়ী আসে, কিন্তু এক শনিবার বেচারাকে সকাল সকাল অফিসে ছুটতে হওয়ায় সে এসব বাইরে বার করে রেখে আসার সময় পায়নি। অতএব অফিসে বসে সে বৌকে মনে করাবার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ-এ লিখলো "ময়লা ভেতরে, খালি বিনটা গেটের বাইরে। শনিবার না?"। লেখার সময় খেয়াল করে নি, পরে দেখলো শ্রীমান অটোকারেক্টের

পাকামিতে মেসেজ গেছে "My Love to Rekha. Living Together. Bye Roshni. Barna?" | যাচ্ছেতাই কান্ড একেবারে। কারণ রেখা যে ওর শালীর নাম, আর রোশনি ওর বৌয়ের!! ওর নিজের ডাকনাম বর্ণ (ভালো নাম সুবর্ণময়)।

মোন্দা কথা, যতদিন না বাংলা "স্পেলচেকার" বা "অটোকারেক্ট" ঘরে ঘরে রিচিং পাউডার বা ডিটারজেন্ট সাবানের মতো নিত্যব্যবহার্য হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, ততদিন বানানভুল ছিল, আছে এবং থাকবে। ছেলেবেলার বেশ কিছু অল্পমধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই জিনিসটার সঙ্গে। ক্লাস ওয়ানে একবার শ্রুতিলিখনের পিরিয়ডে ১৬ কে সোলো আর ১৯ কে উনিস লিখে খাতায় বড় বড় দুটো লালকালির কাটাচিহ্ন পেয়েছিলো। আমার স্কুলজীবনে বানান ভুলের ওটাই প্রথম ঘটনা যা স্পষ্ট মনে আছে। তবে যে ছেলেটা আমার পাশে একই বেষ্ট্রে বসত, সে "র" আর "ড"তে বড়রকম গন্ডগোল করায় ("আমড়া গরুড় গারিতে চরে বারি গেছিলো" ইত্যাদি) ক্লাসটিচার সবিতাদির কাছে প্রকাশ্যে বকুনি খেয়েছিলো -- আমার অতটা দুর্দশা হয়নি। অবশ্য তারও আগে মন্টেরির আপার নার্সারিতে পড়ার সময় ইংরেজী বানান নিয়ে একটা বলার মতো ঘটনা ঘটেছিলো যার আসল মজাটা তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। ডিসেম্বরে ছুটি পড়ার ঠিক আগে আমাদের রঙীন কাগজ কেটে ক্রিসমাস কার্ড তৈরী করা শেখানো হচ্ছিলো। বিক্রম খৈতান নামে আমার এক অবাঙালী সহপাঠী তার বানানো কার্ডে "Mary Christmas" লেখায় আন্টি যখন বললেন ভুল হয়েছে, সে ওটাকে মুছে যা লিখে আনলো তাতে উপস্থিত সব আন্টিই দেখলাম মুখ টিপে

হাসছেন। কারণ এবারে ও লিখেছে "Marry Christmas" | এর চেয়েও মজার একটা গল্প শুনেছিলো আমার কলেজ জীবনের এক বন্ধুর বোনকে নিয়ে। বন্ধু তখন সবে সেকেভারী স্কুলে ঢুকেছে, তার বোন প্রাইমারীতে -- অনেক নীচু ক্লাসে। বইপত্র পড়ার অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। তবে দাদার আগ্রহে বাড়ীতে বাংলা ইন্ড্রজাল কমিক্স রাখা হয় বলে সেসব পড়ে একটু আখটু। সেই সূত্রে জাদুকর ম্যানড্রেক আর তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী "শয়তানের" (লুসিফারের বাংলা সংস্করণ) সঙ্গে পরিচয় ছিল। এরপর একদিন স্কুলে প্রেয়ারের সময় একটা সমবেত সংগীত শিখে এসে বাড়ীতে শোনালো যখন, দেখা গেলো ও মহা উৎসাহে গাইছে "চল রে চল সবে ভারত শয়তান"।

ওয়ার্ডরোবে যেমন কিছু কিছু জামাকাপড় দিনের পর দিন পড়েই থাকে কিন্তু ব্যবহার হয়না বা পুরোনো দিনের দালানকোঠায় যেমন কিছু কিছু ঘর সবসময় তালচাচি বন্ধই থাকে, কোনো কাজে লাগে না, ইংরেজীতে Psychology আর Pneumonia-র P বা Knowledge আর Knife-এর K হলো সেইরকম। ওগুলোর জন্য ছোটবেলায় বানান পরীক্ষায় নম্বর কাটা গেলে কাউকে দোষ দেওয়া যায়না। বাংলায় ওই ঝামেলা নেই, কিন্তু নতুন ভাষাশিক্ষার্থীদের ল্যাঞ্জেগোবরে করে দেওয়ার জন্য রয়েছে কয়েকটা বহুরূপী। যেমন "ণ" আর "ন", "স", "শ" আর "য" এবং "র", "ড" আর "ঢ"। নীচু ক্লাসে শ্রুতিলিখনের সময় ওগুলোর একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করে কার সাধিয়া? "গুট রহস্য" মানে যে ঠাকুমার হেঁসেল থেকে গুড় চুরি যাবার রহস্য নয়, কিংবা "আঘাট" যে খুব একটা আশার মাস নয় (রাতদিন তুমুল বৃষ্টিতে নিরাশ হয়ে ঘরেই আটকে থাকতে হয়), সেটা শিশুমনে গেড়ে বসতে একটু সময় লাগে। আর "মূর্খা", "তালু", "দন্তমূল" -- এসব শব্দের আসল তাৎপর্য বুঝতে গেলে তো রীতিমতো ফিজিওলজি জানতে হবে। সুতরাং একেবারে ছোটদের বাংলা বর্ণমালা শেখানোর সময় স্কুলে বা বাড়ীতে অনেকক্ষেত্রেই "য" কে "পেটকাটা", "শ" কে "উঁচু তালগাছে গোলগোল ফল", "ণ" কে "ল্যাম্পপোস্ট" ইত্যাদি বলে সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব বলার অভ্যাস ছাড়তে না পারলে কী হয়, সেটা দেখেছিলো ক্লাস সিন্ধে উঠে। আমাদের স্কুলে ক্লাস ফাইভ অবধি ছিল প্রাইমারী সেকশন, সকালে যেতে হতো। ক্লাস সিন্ধেই ডে সেকশনের প্রথম বছর। দিদিমণি ছেড়ে এবার স্যার। আমাদের বাংলার স্যার সুদীপ্তবাবু শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর স্নাতক, "অগ্নীশ্বর" সিনেমার উত্তমকুমারের মতো গম্ভীর। একবার ক্লাসে "শোষণ" বানান জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমার এক ভীতু-ভীতু দেখতে সহপাঠী গত পাঁচ বছরের অভ্যাসমতো "উঁচু তালগাছে গোলগোল ফল ওকার পেটকাটা ল্যাম্পপোস্ট" বলতেই উনি চটে গিয়ে "ইয়ার্কি হচ্ছে? সাহস তো কম নয়!" বলে ওকে বেষ্ট্রের ওপর দাঁড়

করিয়ে দিলেন। তারপর থেকে আমরা কেউ আর জীবনে ওসব বলিনি।

ওই বছরেই বানান-সংক্রান্ত আরও একটা ঘটনা ঘটেছিলো যা ভোলার নয়। সুরজিৎ নামে আমাদের ক্লাসের একজন ছটফটে, অমনোযোগী ছাত্রের বানান নিয়ে যে চিরকালের সমস্যা, সেটা আমরা জানতাম। আমাদের মাস্টারমশাইরা তো তখনো জানেন না। ভূগোলের হাফইয়ার্লি পরীক্ষায় ও যথারীতি "নর্দমা"কে "নর্দমা", "তোর্সা"কে "তোস্তা" ইত্যাদি বানিয়ে রেখেছে যথেষ্ট। ভূগোলের স্যার অবনীবাবু ভালোমানুষ, তিনি শুধু খুচরো কিছু নম্বর কেটেছেন ঐরকম ভুলের জন্য। কিন্তু গন্ডগোল বাঁধলো ইতিহাসে। ইতিহাস যাকে পড়াতে দেওয়া হয়েছিল তিনি আসলে উঁচু ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক। তার আগের বছর ইতিহাসের এক প্রবীণ শিক্ষক হঠাৎ অবসর নেওয়ায় কাজ চালানোর জন্য এই ব্যবস্থা। তা এই ভদ্রলোক তাঁর অনভ্যস্ত বিষয় পড়াতে গিয়ে সবসময়েই অস্বস্তিতে থাকতেন আর বোধকরি সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্যই ছাত্রদের ওপর হস্তিত্বিটা একটু বেশীই করতেন। যাইহোক, ব্যাবিলোনীয়ান সভ্যতা সিলেবাসে ছিল, পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে রাজা আসুরবানিপাল, নেবুচাডনেজার আর হামুরাবির ওপর। এবং সুরজিৎও স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বেশ কয়েক জায়গায় হামুরাবিকে লিখেছে "হামুরারি"। খুবই তুচ্ছ ভুল, আদৌ গুরুত্ব দেওয়ার মতো ব্যাপার নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমাদের সেই স্যারের নাম আবার মুরারি ভট্টাচার্য। অতএব জল কিছুর গড়ালা। সেই পরীক্ষায় অনেকেই ভালো করেনি, কিন্তু স্যারের পুরো আক্রেশটা গিয়ে পড়লো সুরজিতের ওপর। ওর খাতায় কড়া মন্তব্য লিখে সেই খাতা বাড়ীতে বাবা-মাকে দিয়ে সেই করিয়ে আনতে বললেন। শেষ অবধি ওর সেটা সাহসে না কুলোনোয় হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছেও নালিশ করেছিলেন উনি। অথচ এই ভদ্রলোকই পরে পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোর সময় দেখতাম নিজেই মাঝেমাঝে বোর্ডে ভুল বানান লিখছেন। আসলে আমাদের বিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে ছাপার দোষে সব "টো" গুলোকে "টো" মনে হতো। উনিও অক্ষরে অক্ষরে সেটাই মনে চলতেন -- এভাঞ্জেলিস্টা টোরিচেল্লি-কে টোরিচেল্লি আর অটো ফন গেরিক-কে অটো ফন গেরিক লিখতেন।

ক্লাস সেভেনে উঠে অবশ্য আমরা এমন একজনকে পেলাম বাংলা পড়ানোর জন্য, যিনি সত্যিই একজন রসিক মানুষ। কথায় কথায় মজা করেন আর হাসান। ব্যাকরণটা উনি দারুণ পড়াতেন, আর বানান ঠিকঠাক মনে রাখার নানারকম চমৎকার উপায় বাতলাতেন। যেমন, আমার কোনো কোনো সহপাঠী তাদের নামের বানান "শুভাশীষ", "স্নেহাশীষ", "অরুণাশীষ" ইত্যাদি লেখে দেখে একদিন ওদের বললেন "ওরে, তোরা ধানের শীষ নোস, পাখির শিস -- এটা মনে রাখিস।" আর সেটা যাতে পাকাপাকিভাবে মনে থাকে, সেজন্য ওদের তারপর থেকে "শুভা whistle", "স্নেহা whistle" বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন, যা বলাই বাহুল্য আমরা বাকিরা খুব উপভোগ করতাম। তা এই সুরতবাবু একবার গরমের ছুটির ঠিক আগে রচনা লিখতে দিলেন "তোমার প্রিয় একটি রবীন্দ্রসংগীত"। আমার এক বন্ধুর (যার রবীন্দ্রসংগীত-টপ্পিতে মোটেই রুচি নেই, মুখে সবসময় হিন্দী সিনেমার গান) সম্ভবতঃ কয়েকদিন আগে স্কুলের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রাইমারী সেকশনের এক দিদিমণির গাওয়া 'শাপমোচনের' দু'একটা গান ছাড়া আর কিছুই মনে নেই, তাই ও সেখান থেকেই একটা বাছলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "র"-ও জীবনে উল্টে না দেখলে যা হয় আরকি, দেখা গেলো "মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি"-র বদলে লিখেছে "মরবি না ওঠে কোন সুরে বাজি"। স্যার শুধু মুচকি হেসে খাতাখানা আমাদের সবার সামনে তুলে ধরে বললেন, "ভাগ্যিস 'বেঁচে থাকবি ওঠে কোন সুরে' লেখিনি।" এবং তারপরেই ওঁর অফুরন্ত মজার গল্পের বুলি থেকে একটা গল্প শোনালেন। উনি যখন আমাদের মতো নীচু ক্লাসে পড়তেন আর ওঁর ভাই প্রাইমারী স্কুলে, একবার নাকি বিজ্ঞানের হোমওয়ার্কের প্রশ্ন ছিল স্বাস্থ্যদায়ক জড়িবুটি ও গাছপালা নিয়ে। উনি চিরতা গাছ নিয়ে লিখলেন, যা থেকে একধরনের তেতো ওষুধ তৈরী হয়। রাতে শুতে যাবার ঠিক আগে বই খুলে মেলাতে গিয়ে দেখেন চিরতার বদলে ভুল করে কালমেঘের (অন্য একরকম তেতো ওষুধি) বর্ণনা লিখে ফেলেছেন। ঘুমজড়ানো চোখে ভাইকে বললেন ওই খাতায় যেখানে যেখানে 'চিরতা' লেখা আছে, রাবার দিয়ে মুছে 'কালমেঘ' করে দিতে। পরদিন সকালে খাতা খুলে দেখেন ওখানে বিজ্ঞানের হোমওয়ার্কের ঠিক পরেই যে বাংলা কবিতা মুখস্থ লিখতে দেওয়া ছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথের "ওরা অকারণে চঞ্চল" কবিতার "চির তাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল" লাইনটাতেও ভাই 'চিরতা' মুছে 'কালমেঘ' করে দিয়েছে!

বাংলা ভাষায় বানান ভুল মানেই কিন্তু শুধু "আকাঙ্ক্ষা" বা "পুঙ্খানুপুঙ্খ" লিখতে গিয়ে অসহায় আত্মসমর্পণ নয়। কোন শব্দের বানানে 'ন' হবে আর কোথায় 'ণ', অথবা স-শ-ষ এই তিনটির মধ্যে কোনটা কখন ঠিক, সে বিষয়েও বিভ্রান্তি কম নয়। ব্যাকরণ বইয়ে "গ্ধবিধান" আর "ষ্ধবিধান" বলে দুটো অধ্যায় থাকে। ব্যাকরণের 'ব্য'ও যারা কোনোদিন হুঁয়ে দেখেনি তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা ওদুটো একটু আধটু পড়েছে তাদের অতটা হিমশিম খাওয়ার কথা নয়। অন্ততঃ "স্যামবাজারের সসীবাবু" বা "শশাগরা পৃথিবী" ধরনের ভুল তাদের হবে না, যদিও "সর্বশেষ" বা "সংশ্লেষ" লিখতে গিয়ে তারাও হেঁচট খেতে পারে। 'র', 'ড়' আর 'ঢ'-র জন্য ঐরকম কোনো অধ্যায় না থাকলেও মানুষের উচ্চারণ শুনে প্রথমটা আর পরের দুটোর মধ্যে তফাৎ করা যায় (অবশ্য 'ড়' আর 'ঢ'-এর ফারাক বোঝানোর মতো শুদ্ধ উচ্চারণ খুব কম লোকেরই আছে)। তবু 'র', 'ড়' আর 'ঢ'-এর গন্ডগোল-জনিত মজার অভিজ্ঞতা বোধহয় আমাদের সবার জীবনেই হয়েছে। মনে আছে অনেক ছোটবেলায় একবার আমার দিদিমার নির্দেশে তাঁর জবানীতে আমার বীরভূম-নিবাসী বড়মাসীকে চিঠি লিখেছিলাম তখনকার দিনের সেই একচিলতে ঘিয়ে-ঘিয়ে রঙের পোস্টকার্ডে। তাতে আমার মামা তাঁর বাড়ী থেকে ট্যাক্সি পেতে দেরী হওয়ায় দেরী করে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন মিস করেছেন সেই খবরটা দিতে গিয়ে লিখেছিলাম "মামা পড়ে গেছে তাই ট্রেন ধরতে পারেনি"। বলাই বাহুল্য কথাটা "পরে" হবে, "পড়ে" নয়। সেই চিঠি পেয়ে মাসীর বাড়ী থেকে উদ্বিগ্ন টেলিগ্রাম এসেছিলো কোথায় লেগেছে, হাড়গোড় ভেঙেছে কিনা জানতো। এর উল্টো গল্পটা শুনেছিলাম আমার এক মাসতুতো দাদার কাছে। হাইস্কুলে নীচু ক্লাসে ওর এক চূড়ান্ত ফাঁকিবাজ সহপাঠী নাকি একবার পরীক্ষায় সাদা খাতা জমা দেয়, তাতে শুধু লেখা "স্যার, আমি আজ কিছু না পরেই পরীক্ষা দিতে এসেছি, কাল আমার দাদু মোড়ে গেছেন"। এ খাতা পেয়ে 'স্যারের' প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, সেই কৌতূহল আমার আজও যায়নি। আমি প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় দেখতাম পাড়ার কচিকাঁচার বিকেলে লুকোচুরি খেলার সময় দরজা খোলা পেয়ে আমাদের পাশের বাড়ীতে ঢুকে খাটের তলায় বা আলমারীর পিছলে লুকোলেই ওই বাড়ীতে যিনি কাজ করতেন তিনি উচ্চঃস্বরে "এই, বেড়িয়ে আয়, বেড়িয়ে আয়, সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে খুব মশা কামরায়" বলে চোঁচাতেন। বোঝাই যাচ্ছে আসলে কী বলতে চাইতেন। এখনও প্রায়ই অনেককে লিখতে দেখি "অমুকে এখন বেরাতে বেড়িয়েছেন"। এই প্রসঙ্গ শেষ করি একটা স্বীকারোক্তি দিয়ে। আমিও ছোটবেলায় যখন প্রাইমারী স্কুলের গানের দিদিমণি 'তাসের দেশের' সেই বহুশ্রুত রবীন্দ্রসংগীতটি প্রথম তুলিয়েছিলেন, গানের খাতায় লিখেছিলাম "খড় বায়ু বয় বেগে"।

একে তো ব্যঞ্জনবর্ণের এই গোলকধাঁসায় মানুষ নাজেহাল, তার ওপর আবার আছে স্বরবর্ণের ফাঁদ। একেবারে বিতত বিতংসা এবং পরিস্থিতি আরো জটিল করে দিয়েছেন জোড়াসাঁকোর নোবেল লরিয়েট। আমরা সেই কোন ছোটবেলা থেকে 'দেরি', 'ভারি', 'তরকারি' এসব লিখলে খাতায় ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ লালকালির দাগ আর পিঠে স্কেলের বাড়ির দাগ পেয়ে পেয়ে দীর্ঘ ঈ-র মাহাত্ম্য বুঝতে শিখেছি, আর উনি কিনা 'সহজপাঠে' এইসব বানানে হ্রস্ব-ই লিখে দিবি পার পেয়ে যান! 'ভারি' অন্যান্য তো!! জানিনা, আমাদের মতো ওঁরও হয়তো "বিভীষিকা"কে বিভীষিকা মনে হতো বা "মরীচিকা"র ভুলের ফাঁদে উনিও বারবার জড়িয়েছেন। তারই শোধ তুলেছেন 'সহজপাঠে'। কিন্তু একা রামে রক্ষা নেই, সঙ্গে সুগ্রীব দোসর -- 'হ্রস্ব উ' আর 'দীর্ঘ উ'। সত্যি কথা বলুন তো, "মুমূর্ষু" আর "শুক্রযা" বানানে হ্রস্ব-উ আর দীর্ঘ-উ ঠিকঠাক মনে রাখতে গিয়ে আপনি কি কখনো মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিলেন বা আপনার শুক্রযা দরকার হয়েছিল? হলে অবাক হবো না। "মুহূর্ত" আর "মুহুমুহু" নিয়েও হয়তো মাঝেমাঝে ধাঁধায় পড়তে হয়েছে। পাড়ায় দুর্গাপুজোর চাঁদা চাইতে গিয়ে বড়দের কাছে কখনো না কখনো নিশ্চয়ই শুনতে হয়েছে "একী? চাঁদার বিলবইয়ে 'দুর্গা' লেখা কেন? আগে বানান ঠিক কর তারপর চাঁদা পাবি"। আর "ভুল"কে "ভুল" লেখার জন্যও হয়তো হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে এক বা একাধিকবার। এসব ভাবলে যদি বিরক্তিতে বলে উঠতে ইচ্ছে করে "দূর ছাই! কোন দুঃখে বাংলা মিডিয়ামে পড়তে গিয়েছিলাম? ইংরেজী কত ঝামেলাহীন", তাহলে এমনিতে আপত্তি নেই, কিন্তু "দূর"-এ দীর্ঘ উ আর "দুঃখে" হ্রস্ব উ -- সেটা যেন খেয়াল থাকে। নাহলে অদূর ভবিষ্যতে দুঃখ

পেতে হতে পারে। মনে আছে তো বিদ্যাসাগরের সেই গল্পটা -- একজন কী একটা সমস্যায় পড়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিল "আমার খুব দুরবস্থা" আর তিনি উত্তরে লিখেছিলেন "সেটা আপনার 'আকার' দেখেই বোঝা যাচ্ছে"। অর্থাৎ "দুরবস্থা"কে "দুরবস্থা" লেখার জন্য বিদ্যাসাগরীয় ভঙ্গীতে একটু বকুনি আর কি! অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে এমন শব্দও আছে যাদের লিখিত আকার না দেখলে শুধু উচ্চারণ শুনে বোঝার উপায় নেই যে তাদের আসলে কোনো 'আকার' নেই। কাজেই শ্রুতিলিখনের সময় ওগুলোর সঠিক বানান লিখতে "ব্যর্থ" হলে সেই "ব্যর্থ" উপশমের "ব্যবস্থা" আপনাকেই করে রাখতে হবে।

অ-কার আর ও-কারের মধ্যে গুলিয়ে ফেলাটাও খুব স্বাভাবিক, বিশেষতঃ আমাদের যখন অনেক অ-কারান্ত শব্দকেই "ও"-এর মতো উচ্চারণ করার রীতি। আমাদের উচ্চারণ নিয়ে আমার এক হিন্দীভাষী বন্ধু একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, "তোরা সবসময় মুখে রসগোল্লা নিয়ে কথা বলিস"। তবে একদা পশ্চিমবঙ্গের এক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বাক্ষরতা অভিযান নিয়ে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে যে মাঝেমাঝেই লেখা থাকত "চলো পোড়াই, কিছু করে দেখাই", সেটা খুব সম্ভবতঃ ওই কারণে নয়। যারা ওগুলো লিখতো তারা নিজেরা ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার বদলে "পোড়াশোনা" করেছে হয়তো -- তাই ওই হাল। আমার ছোটবেলায় যখন খবরের কাগজে পড়তাম "অসমে বড়োদের আন্দোলন ও বিক্ষোভ", মনে মনে ভাবতাম ওই রাজ্যে বড়দের বুঝি ছোটদের মতোই কড়া শাসনে রাখা হয়, কলকাতায় আমার দেখা বড়দের মতো যা খুশী তাই করতে পারেনা তারা -- তাই এতো রাগ। তখন তো আর জানতাম না "বড়ো" (যাদের অনেকসময় "বোড়ো"ও লেখা হয়) অসমের একটা জনগোষ্ঠীর নাম। আমার এক খুড়তুতো বোন কচিবয়সে প্রথম যখন রবীন্দ্রসংগীত শিখতে শুরু করে, "আমার পরাগ যাচা চায়" বা "আমি চঞ্চল হে"কে কিছুতেই প্রথা মেনে "আমারো পরানো যাচা চায়" বা "আমি চঞ্চলো হে" এভাবে গাইতে চাইতো না, বলতো হলুদ মলাটের বইটায় (মানে গীতবিতানে) তো ওরকম লেখা নেই। ওই বোনই একবার পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছিল "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে/ জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৈরভ রভসে/ ঘনগৈরবে নব জৈবনা বরষা" ইত্যাদি। শব্দগুলোর মানে জানলে ও হয়তো বুঝতো যে এই লাইনকটায় কবির আসল উদ্দেশ্য 'ঐ'-এর অনুপ্রাস তৈরী করা নয়। এ-কার নিয়েও মাঝেমাঝে মজার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমাদের কলেজের হোস্টেলে আমরাই পালা করে মেস-ম্যানেজার হতাম, অর্থাৎ এক-এক মাসে এক-একজন মাসকাবারি আর দৈনিক বাজারের হিসেবে রাখতাম। সে-বাজার আমাদের করতে হতোনা, একজন লোক এসে দিয়ে যেত। শুধু সপ্তাহে যেকদিন মাছমাংস হতো, ম্যানেজারের নির্দেশ অনুযায়ী তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে অন্য কোনো একজন ছাত্র সেটা এনে দিতো দোকান থেকে সকালবেলা। একদিন কী একটা উপলক্ষ্যে আমাদের বিশেষ খাওয়াদাওয়া -- যাকে বলে গ্র্যান্ড ডিনার। সেদিন চুনো মাছ আনার কথা নয়, কিন্তু যে নবাগত অনভিজ্ঞ ছেলেটির ওপর দায়িত্ব পড়েছিল সে ভুল করে ট্যাংরা আর বাটামাছ এনে রেখে গেছে রান্নাঘরে। রান্নাঘরের কাছে খবর পেয়ে ম্যানেজার ছেলেটির ঘরে ঢুকে (সে তখন ঘরে ছিলনা, বাথরুমে ছিল) টেবিলে একটা চিরকুট রাখলো "আজ তো স্পেশ্যাল রান্না, ছোট মাছ কেন"। স্নান-টান সেরে ঘরে এসে ওই চিরকুট পেয়ে বেচারি আবার তড়িঘড়ি বাজারে ছুটলো, এবার নিয়ে এলো মৌরলা! ছেলেটাকে দোষ দেওয়া যায়না, ও বুঝবে কী করে যে ম্যানেজার আসলে কৈফিয়ত চেয়েছে, আবার কিনতে যেতে বলেনি? আর ম্যানেজারকেও কি অভিযুক্ত করা ঠিক হবে "ক্যানো?" না লিখে "কেন" লেখার জন্য? আমরা তো ওরকমই লিখি।

সব স্বরবর্ণকে ধরে ধরে খলনায়ক বানালাম, ঋ-কারই বা বাদ যায় কেন? আমার হাইস্কুলের এক সহপাঠীর দৌলতে স্মরণীয় হয়ে আছে এই ঋ-কার। একবার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "হাট" কবিতাটির সেই বিখ্যাত পংক্তি "বিকালবেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা" র তাৎপর্য লিখতে গিয়ে ও বোধহয় "অবিক্রীত পণ্য"র বদলে লিখেছিলো "অবিকৃত পণ্য"। তাতে বাংলার টিচার যে নম্বর কেটেছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই ওর মনে বেশ ভালোরকম দাগ কেটে থাকবে। কারণ তারপর ও জীবনবিজ্ঞানে "যকৃৎ"কে "যক্রীত" আর "কৃমি"কে "ক্রীমি" লেখা শুরু করলো। ওর বানানের বহর দেখে আমাদের জীবনবিজ্ঞানের টিচার ওকে ইংরেজীতে পরীক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দিলেন (আমাদের বাংলা-মাধ্যম স্কুল হলেও বিজ্ঞানের বিষয়গুলো বোর্ডের পরীক্ষায় দুটো ভাষাতেই দেওয়া যেত), কিন্তু তাতে আবার উল্টো বিপত্তি। এবার শুনলাম ও জীবন্ত জীবাশ্মকে living fossil না লিখে alive fossil আর heart muscle-কে hurt mussel লিখেছে।

তাহলে শেষমেষ কী দাঁড়ালো? দাঁড়ালো এটাই যে, 'বানান ভুল জিনিসটা অনেক লাঞ্ছনা, পিটুনি, উপহাস-পরিহাস আর বিড়ম্বনার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও দিনের শেষে ওটা আমাদের জীবনে এক অফুরন্ত মজার উৎস। ভাবুন তো -- বাংলা সাহিত্যে সব মজারুর সেরা মজারু সুকুমার রায়ের সেই অনবদ্য 'খিচুড়ি' পানসে হয়ে যেতো না বানান ভুল না থাকলে? তার প্রথম লাইনটাই যে "হাঁস ছিল সজারু, ব্যাকারণ মানি না ---"

\*\*\*





# চুনোপুঁটি

পল্লব ভট্টাচার্য্য

দুপুরের ভাতঘুমটা হঠাৎ-ই ভেঙ্গে গেল চুনীর। এই বছর পাঁচ হল দুপুরে ঘুমোর একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে ওর। তা হবে নাই বা কেন? বয়স তো আশী পেরিয়ে গিয়েছে। সারা জীবন অনেক খেটেছে, তা এখন একটু মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নিলে মন্দ কি? একটু জল খেতে গিয়ে ঘরের কোণায় রাখা টিভির দিকে নজরটা চলে গেল। আর তখনই পেল সেই খবরটা।

গাটা যেন কেমন গুলিয়ে উঠল চুনীর। একটু বমি বমি ভাব এল। ও চুপচাপ গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল। এতগুলো লোক মারা গেল! খবরে অবশ্য বলছে যে এই দুর্ঘটনা আরও মর্মান্তিক হতে পারত। নেহাত ছুটির দিন বলে ব্রিজের ওপর বেশী লোক ছিল না। ব্রিজের নিচেও দোকানগুলো বন্ধ ছিল দুপুরের দিকে। ঘটনাস্থল থেকে যে অল্পবয়স্ক ছেলেটা রিপোর্ট দিচ্ছে, সে রীতিমত উত্তেজিত। একজন যুবতী সাক্ষাৎকারে বলল যে তার চোখের সামনেই নাকি ব্রিজটা ভেঙ্গে পড়েছিল। একজন স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার বলছে যে ষাট বছরের পুরনো এই ব্রিজ যে প্রযুক্তির ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল, সেটা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার এক অতি গর্বের বিষয় বলে মনে করা হয়। রিপোর্টার ছেলেটির পালাটা প্রশ্ন “তবে কি সরকারি গাফিলতির জন্যে ভেঙ্গে পড়ল এই ব্রিজ? না কি এটা কোন আতঙ্কবাদের কাজ?” মাথাটা যেন একটু ঘুরে উঠল চুনীর। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। আকাশে মেঘ করে আসছে, অনেকটা সেইদিনটার মত।

তখন চুনীর শরীরে অনেক জোর। সদ্য তাহেরপুর থেকে কলকাতায় এসেছে সে। তার গ্রামের বিশুদা তাকে ছোটখাটো কাজ জোগাড় করে দিত। সেই সুবাদেই নতুন একটা কাজ শুরু করেছিল সে। একা থাকে, সারাদিন পাগলের মত কাজ করে। কোন গাফিলতি নেই কাজে। সেখানেই কাজ করতে আসত নুসরত। চুনীর খুব ভাল লাগত নুসরতকে। মনে হত নুসরত থাকলে তার যেন গায়ের জোর আরও বেড়ে যেত; ঐ মেয়েটাকে দেখিয়ে যেন আরও বেশী কাজ করত সে। সে জানত যে নুসরতেরও তাকে ভাল লাগত।

হঠাৎ একদিন কাজে নুসরত এলো না। মনটা যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল চুনীর। দুপুরে খাওয়ার সময়ে ও চলে গেল নুসরতের বস্তিতে। কাজের দিনে দুপুরে এক ঘণ্টা খাওয়ার ছুটি পেত সে। গিয়ে দেখল নুসরত শুয়ে আছে।

“আজ কাজে আসিসনি কেন?” “শরীরটা ঠিক ভাল লাগছে না।” “খেয়েছিস কিছু?” “না।”

নিজের খাবারের কৌটো থেকে রুটি ভাগ করে সেদিন নুসরতের সঙ্গে খায় চুনী। তারপর নুসরত তাকে আরও একটু থেকে যেতে বলে। একটু বেশীই থেকে গিয়েছিল চুনী। নুসরতকে যে বড্ড সুন্দর লাগছিল সেদিন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চুনী দেখল যে দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। সে বুঝতে পারে যে তার কপালে দুঃখ আছে। হস্তদন্ত হয়ে দৌড়িয়ে কাজে ফেরত যায় সে। আজকে যদি সময়ের মধ্যে ঢালাই শেষ না করে তাহলে সময়ের মধ্যে বড়বাবুদের এই “প্রোজেক্ট” শেষ হবে না। ফেরৎ গিয়ে দেখে বড়বাবু নেই – হাঁপ ছেড়ে বাঁচে সে। আকাশ কালো করে মেঘ করে আসছে। একটু যেন চট জলদি করেই ঢালাইটা করে ফেলে সে। মনের মধ্যে একটা খটকা লাগল। কিন্তু তখনই মনে পড়ল নুসরতের ঘর থেকে বেরোনোর ঠিক আগে নুসরতের কথাটা। আর খটকাটা চলেও গেল।

আজ ষাট বছর পরে নুসরতের সেই কথাটাই মনে পরে গেল চুনীর – “আরে তুই দেবী করে গেলে কি হবে রে? তুই তো একটা চুনোপুঁটি।” মন থেকে সব দূর্শিস্তা যেন চলে গেল, সত্যিই তো সে সামান্য এক চুনোপুঁটি। সে কি পারে একটা গোটা ব্রিজ ভেঙ্গে ফেলতে? অত ক্ষমতা কি তার আছে? বা কোনদিন ছিল? হতেই পারে না। দেখল নুসরত পাশে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। আজ তাকে যেন আরও সুন্দর লাগছে এই ষাট বছর পরেও। টিভিতে তখন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখছেন। চ্যানেলটা পালটে দিল চুনী। আর ফোনটা নিয়ে একটু আগে টিভির পর্দায় দেখা নম্বরটায় ফোন লাগল সে। আজ যেন নিজেকে “চুনোপুঁটি” ভেবে জীবনে প্রথম একই সঙ্গে গর্বে আর শান্তিতে মন ভরে গেল চুনীলাল পটবর্ধনের।

# যোগ ও দুর্গোৎসব

অনিল বিশ্বাস, কলকাতা

যোগ নিয়ে অনন্তকাল ধরে ব্যাখ্যা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে যোগের অনুষ্ঠানও হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন মুনি, ঋষি, সাধুসন্ত, পণ্ডিত ও বিজ্ঞ জনেরা যোগের চর্চা করেছেন এবং তার ফলও লাভ করেছেন। বিভিন্নজন বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা ও চর্চা করেছেন, তা সত্ত্বেও সকলেই এক বিন্দুর চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

"যোগ কৰ্ম সুকৌশলম", কৰ্মের কৌশলই যোগ, তা সে যে ধরনের কৌশল হউক না কেন! জীবনের প্রতি পদে কোন না কোন কাজ করছি কোন না কোন কৌশলের মাধ্যমে। অতএব প্রতিপদেই আমরা যোগ করছি আমাদের অজান্তে।

আবার বলছে, " যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ": চিত্তের বৃত্তিকে নিরোধ করার নাম যোগ। মনের সব জল্পনা কল্পনাকে বন্ধ করার নাম যোগ। মনকে যদি কোন উপায় শান্ত করা যায় বা কোন এক বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া যায় তাকেই যোগ বলে। সেই উপায়ই বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী অভিজ্ঞ মহাপুরুষ বিভিন্ন সময়ে এর ব্যাখ্যা ও চর্চা করেছেন। আবার বলছে জীব-আত্মাকে পরমাত্মার সাথে মেলানাকেই যোগ বলে।

যোগ সাধারনতঃ কয়েক প্রকার:-

মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি।

রাজযোগের মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগই আমাদের আলোচনার বিষয়।

মন্ত্র জপের মাধ্যমে মনকে এক বিন্দুতে নিয়ে যাওয়াকে মন্ত্রযোগ বলে।

ভক্তি, শ্রদ্ধার মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে লীন হওয়াকে লয়যোগ বলে।

বিভিন্ন কঠিন শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনকে শান্ত করে পরমাত্মায় নিয়ে যাওয়াকে হঠযোগ বলে। হঠযোগ সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

সৈদিক থেকে রাজযোগ অনেক সহজ ও সরল। রাজযোগে সব যোগ থেকেই কিছু না কিছু ভাল প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। রাজযোগে অষ্টাঙ্গযোগ রয়েছে। যেমন: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যম: যম মানে অহিংসা, অস্তেয় (চুরি না করা), সত্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

নিয়ম: নিয়মে আছে শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান।

আসন: আসন অনেক প্রকার। তারমধ্যে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ও সরল সুখাসনই বেশী ব্যবহার হয়।

প্রাণায়াম: যম, নিয়ম ও আসন সিদ্ধ হলে প্রাণায়াম করার ক্ষমতা বা অধিকার হয়। শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করাকেই প্রাণায়াম বলে। অভিজ্ঞ যোগীর কাছে প্রাণায়াম শিখতে হয়। একা একা বা না জানা কারোর কাছে প্রাণায়াম করা বিপদজনক।

প্রত্যাহার: ধারণার আগে ও প্রাণায়ামের পরে যা আছে তাকে বলে প্রত্যাহার। সব ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করাই হল প্রত্যাহার।

ধারণা: মনকে কোন কিছুতে একাগ্র করার নাম ধারণা।

ধ্যান: ধারণা গভীর হলে হয় ধ্যান।

সমাধি: আর ধ্যান গভীর হলে হয় সমাধি।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এই হল অষ্টাঙ্গ যোগ, ঋষি পতঞ্জলি এর প্রণেতা।

অভিজ্ঞ যোগীর কাছে যোগ অভ্যাস করতে হয় তবে ভাল ফল লাভ করা যায়।

এরপর রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আসন। বসে, শুয়ে ও দাঁড়িয়ে অনেক ধরনের আসন এর উপদেশ দিয়ে গেছেন বিভিন্ন যোগীরা। যোগের মাধ্যমে সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মানুষের জীবনে যোগ অমৃত সমান। শুধু একটাই শর্ত, তা হচ্ছে নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে যোগের অভ্যাস করতে হবে। দুই বেলা না পারলে অবশ্যই এক বেলা করতে হবে, তাতেও উপকার হবে। যোগ অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে আর সুস্থ মানুষকে সুস্থ রাখে। এই হল যোগ সম্পর্কে দু-চার কথা।

দুর্গা পূজার মহাষ্টমীর দিন যোগ শুরু করার শ্রেষ্ঠ দিন। জয় মা দুর্গা।

"সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে

শরণ্যে ব্রহ্মকে গৌরি নারায়ণী নমস্তুতো।"

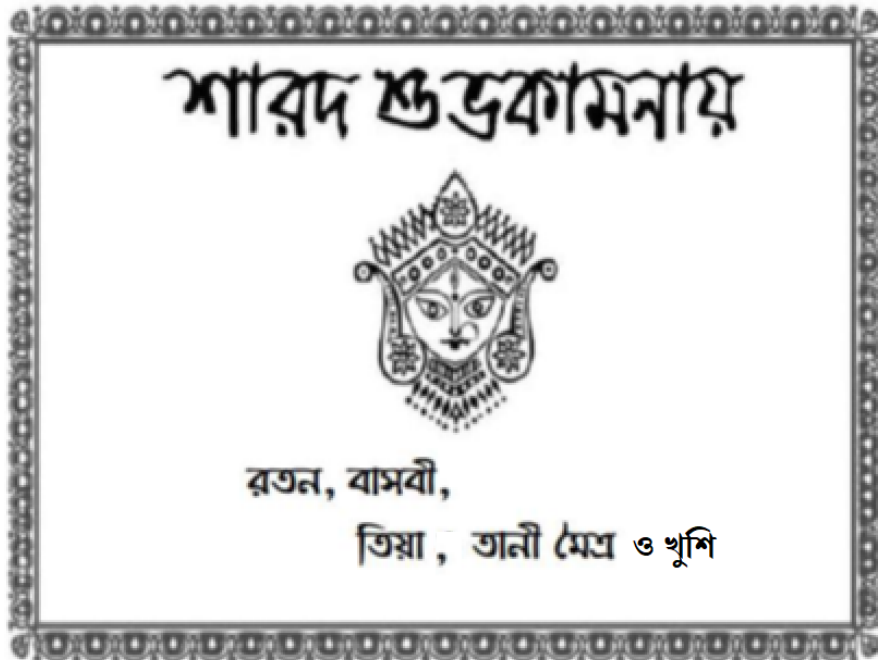
মহালয়ার পরের দিন থেকে শুরু হয় নবদুর্গার উৎসব "নবরাত্রি", চলে দুর্গাপূজার নবমী পর্যন্ত। কাশীধামে নবদুর্গার মন্দির, সেখানে নয় দিন ধরে পূজা ও উৎসব হয়। নব দুর্গা হল শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিনী, চন্দ্রঘনটা, কুম্বাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী। দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন সব থেকে পবিত্র, তাই ঐদিনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। যোগের ও যে কোন অনুষ্ঠান ঐদিন শুরু করলে মায়ের আশীর্বাদে তা সফল হয়।

"হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে

গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত

নমহস্তুতো।"

ওঁ শান্তি: ওঁ শান্তি: ওঁ শান্তি: শান্তিহি:॥





# মানুষ

অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

বাবাই কাল সকালে আমায় ওয়াটার টাউনের গ্রে হাউন্ড বাস স্ট্যান্ড থেকে নিয়ে যেতে পারবে? - প্রায় আট দশ মাস পরে এমন দুপুর বেলায় হঠাৎই কাজের মাঝে গোপালের এরকম একটা ফোন পেয়ে দীপু প্রথমটা একটু হকচকিয়ে উঠেছিল। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারল, শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে গোপাল আজ আর কলেজ যায়নি। বদলে মায়ের সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাসপোর্টটা বার করেছে। ওটাওয়া থেকে রাতে ট্যাক্সি চড়ে আসবে গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে, সেখান থেকে বাসে বর্ডার পেরিয়ে ওয়াটার টাউন। বাড়ি থেকে কলেজে যায় বলে যেটুকু হাতখরচা পায় তা থেকেই কিছু টাকা জমিয়েছে ট্যাক্সি বা বাসের খরচের জন্য।

আনন্দে উত্তেজিত দীপু তড়িঘড়ি কাজ থেকে বেরিয়ে গোপালের পছন্দমতো কিছু চিংড়ি, আম ইত্যাদি কিনে বাড়ি ফিরেই লেগে গেলো রান্নাবান্নায়। আজ প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেলো গোপাল এ বাড়ি ছাড়া। শুধু কি তাই, প্রথম দু তিন বছর তবুও কোর্ট অর্ডার নিয়ে, সিরাকুস থেকে ওটাওয়ায় গিয়ে, স্থানীয় হোটেল থেকে তার আদরের গোপালের সঙ্গে বার কয়েক দেখা করে এসেছে। কিন্তু শ্রাবণী তার দ্বিতীয় স্বামী অশেষের সঙ্গে ফন্দি করে সে পথও মেরে দিয়েছে। ই-মেইল বা ফোনেও যাতে যোগাযোগ না রাখতে পারে তার দিকেও ওদের সদা সর্বদা কড়া নজর। আজ তাই এতদিন পরে তার প্রাণাধিক গোপালের কাছ থেকে এমন এক অপ্রত্যাশিত ফোন পেয়ে দীপুর তাৎক্ষণিক হতভম্ব ভাবটা কাটতেই মনটা এক অজানা আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে কেবলই মনে প্রশ্ন জাগছে - তাহলে কি আবার আমি গৃহীর জীবনে ফিরে যেতে চলেছি? এই তো কদিন আগেও পরিকল্পনা করছিল, সামনের বছর অগ্রিম অবসর নিয়ে জমানো টাকা সব গোপালের নামে হস্তান্তর করে দিয়ে মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাদের বংশের কুলগুরুর আশ্রমে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। সে জায়গায় আজ গোপাল নিজে তার মার কাছ থেকে রাতের বেলায় পালিয়ে চলে আসছে এখানে থেকে যাবে বলে। এখন কত চিন্তা মাথায় আসছে। তাহলে গোপালের ADD (Attention Deficit Disorder)র প্রকোপ কি বাড়ল? সিরাকুসে নিজের কাছে যতদিন ছিল চিকিৎসার তো কোনো ক্রটি রাখিনি। ১৮ বছরের পর চাইল্ড সাপোর্টের টাকা আইনত না দিতে হলেও টাকা তো সমানে দিয়েই চলেছি। প্রধানতঃ কলেজের টিউশনের জন্য হলেও কিছু তো উদ্বৃত্ত থাকেই। ছেলেটার ঠিক মত চিকিৎসাটাও কি করতে পারেনা? হবে হয়তো! এই তো সবে পাঁচ বছরের নতুন বিয়ে। ফুর্তিতে ডগমগ, ছেলেটার দিকে নজর দিতে বয়েই গেছে।

ওয়াটার টাউন থেকে আর একটা বাসেই গোপাল কে নিয়ে ফিরছিলো সিরাকুসে। গলায় হাতের কয়েক জায়গায় কালশিটে দাগ দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে দীপু- হাঁরে, এগুলো কিসের দাগ? - ঐ লোকটা যে আমায় প্রায়ই মারে। তুমি যে টাকা পাঠাও তার সঙ্গে কলেজের স্কলারশিপের টাকা যোগ করে আমার ভালোই চলে যাবার কথা - তা সত্ত্বেও আমাকে ওরা জামা-কাপড়, বই-খাতা, খাবার-দাবার ঠিকমতো দিতে চায় না; বললেই মারধর করে, বলে তোমার কাছ থেকে আরও টাকা চাইতে। প্রথম দিকে আমার গ্রেড ভালোই হচ্ছিলো, তাই তো স্কলারশিপ টা পেয়েছিলাম। কিন্তু ওই বাড়িতে যে অশান্তি আর অত্যাচার! গ্রেডও খারাপ হতে শুরু করল, আমিও আর সহ্য করতে পারছিলাম না বলেই তো এইরকম লুকিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। তোমার সঙ্গে আজ এতো মাস ওরা যোগাযোগ করতে দেয় নি। বাবাই কি বলব, আমার কি যে কষ্ট হচ্ছিল! তোমাকে কাল ফোন করার আগে সেজন্য ভয় করছিল - হয়ত তুমি চাইবে না, মায়ের কাছ থেকে এভাবে চোরের মতো চলে আসতে মত দেবে না, হয়তো আমাকে ভুলেই গেছে, হয়তো আর আমাকে তোমার বাড়িতে থাকতে দেবেনা। কিন্তু বাবাই, তুমিই বল, তুমি ছাড়া আমি কি করে বাঁচি?

দীপুর এখন অনেক কাজ। নিজে যেমন ভালো গাইতে পারে, ছেলেকেও অনেক শখ করে শিক্ষক রেখে পিয়ানো শিখিয়েছিলো। কিন্তু আগেকার সেই বড়ো বাড়িটার সঙ্গে পিয়ানোটাও বেচা হয়ে গেছে। এখন একজনের সংসারে দুটো মাত্র বেডরুম। তবুও একটা পিয়ানো জোগাড় করতেই হবে। ছেলেটা পিয়ানো বাজালে খুবই সুস্থ বোধ করে। নিজেরও মনটা তৃপ্ত হয়। নিজেরই ইউনিভার্সিটিতে বিনা খরচে কলেজের পড়াটা চালিয়ে যেতে পারবে। গোপাল কিছুতেই গাড়ি চালানো শিখতে চায়না - তাতে কি যায় আসে? একার জীবনে গোপাল তো এসে গেছে? বাকি জীবনটা সুখে-দুঃখে ঠিকই কেটে যাবে। আশ্চর্যের ব্যাপার, গোপাল এসে পর্যন্ত আর মাকে একবার ফোনেও জানায়নি, তার মাও এখানে খোঁজ করেনি। ধরেই নিয়েছে কোথায়ই বা আর যাবে? বাবার কাছে ছাড়া? গোপাল নামটাও যে দীপুরই দেওয়া। একে একে মনের পর্দায় সব ভাসতে শুরু করেছে। উচ্চশিক্ষার্থে দীপু বছরদিনই দেশ ছাড়া। তবু বছর পাঁচশ আগে দুপক্ষেই বাবা মায়ের মধ্যস্থতায় শ্রাবণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। এদেশে এসে পর্যন্ত ভালয় মন্দয় শ্রাবণীর দিন ঠিকই কেটে যাচ্ছিল। বাধ সাধল এদেশের কর্মব্যস্ততার মাঝে তার নিরলস গৃহবন্দীর জীবন। প্রায়ই হাঁফিয়ে

উঠছিলো। উপায়ান্তর না পেয়ে দীপুই ওকে কাছাকাছির মধ্যে ইমিগ্র্যান্ট কর্মীদের তদারকির এক অফিসে সপ্তাহে ২০ঘন্টা করে একটা কাজ জোগাড় করে দিল। স্বভাবতই শ্রাবণী খুবই খুশী, কে আর এই বয়সে ঘরে বন্দী থাকতে চায়? কয়েকবছর একটু সড়গড় হতে না হতেই একদিন শ্রাবণী দীপুকে খবরটা দেয় - দীপুর তো তখন আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা। ইরানিয়ন ছেলোট্ট এখন এদেশ থেকে বহিষ্কৃত, সুতরাং তোমাকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে। দীপু ভালো মানুষ, সারাক্ষণ নিজের গবেষণা আর অবসর সময়ে প্রাণায়াম, ক্রিয়াযোগ ইত্যাদি নিয়ে থাকে। কিন্তু ভালো মানুষেরই যে বোঝা বড়। অনেক সাতপাঁচ ভেবে দীপুরই পিতৃপরিচয়ে সন্তানের জন্ম হল - শুভ্র নধর কান্তি দেখে দীপুর তাই গোপাল নামটাই প্রথমে মনে এসেছিল।

সেই গোপালের ছোটবেলা থেকেই দীপু ওরফে বাবাই তার সবকিছুর দেখাশুনা করে আসছে। গোপালকে পেয়ে দীপুর প্রাণায়াম ইত্যাদিতে একটু ভাটা পড়ল বটে। কিন্তু শ্রাবণীর মনের অপরাধবোধ যেন উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকল। বহিষ্কৃত ছেলোট্টির কারণে বা দীপুর উদ্বেগহীন আচরণে শ্রাবণী যেন দিন দিন আবারও অধৈর্য্য হয়ে উঠছিল। ছেলে বড় হচ্ছে, ধীরে ধীরে হাই স্কুলের দরজায় এসে পড়ল, অথচ ছেলের সঙ্গে সেই টানটা গড়ে উঠতে যেন কোথায় এক অমোঘ বাধা। দীপুর বেশ কিছু চিকিৎসক কর্মীদের মধ্যে দু'একজন আবার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তাদের সঙ্গে বিশদে আলোচনায় জেনেছে যে এধরণের আচরণকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে নার্সিসিস্টিক, যা কিছুটা বংশগতও বটে। দীপুর শ্বশুরবাড়িতে কয়েকজনের সঙ্গে এনিয়ে অল্প আলোচনা করে দেখেছে, তাঁরা আলোচনায় যেতে খুব একটা আগ্রহী নয়। এতো সবকিছুর মাঝেই সুযোগসন্ধানীর মতো শ্রাবণীর জীবনে দুম করে এসে জোটে অশেষ। গোপাল একটু আধটু দীপুকে জানবার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু দীপু কোনদিনই ব্যাপারটাকে আমল দেয়নি। একদিন সরাসরি দীপুর নজরে পড়ার পর থেকেই অনেক বার শ্রাবণীকে ফেরাবার চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে গোপালের কথা ভেবে।

কিন্তু এ বস্তু সচরাচর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। হলও তাই। প্রথমে কথা বন্ধ, তারপর শুরু হল অশেষের সঙ্গে আলাদা থাকা, অবশেষে বিবাহবিচ্ছেদ। কিন্তু গোপাল যে দীপুর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। যতই সে মনমরা হয়ে শুকিয়ে থাক, টাকাকে টাকা না বলে শেষ পর্যন্ত কোট-কাছারি করে গোপালের সঙ্গে যেন তার সপ্তাহান্তে যোগাযোগ থাকে তার ব্যবস্থা সে করেছে। যখনই শ্রাবণী ছলে বলে সেই কোর্টের আদেশ লঙ্ঘন করেছে তখনই দীপু গর্জে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সেই অশেষেরই প্ররোচনায় দীপুর সঙ্গে চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য কাছাকাছি কানাডার ওটাওয়া শহরে দুজনে চাকরি নিয়ে চলে গেল। অথচ পুত্র থেকে বিচ্ছেদ দীপু সইতে পারল কই? আর তার আদরের গোপাল? সেও কি পারল তার বাবাইকে ছেড়ে থাকতে?

\*\*\*

স্নাতঃ,

“অক্ষজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ”-

\* \* \* \* \*



সবাইকে জানাই শারদীয়া শুভেচ্ছা।

উবী,

বৈশাখী ও জহর

# ডায়েরি : ১৯৮২ সাল

তিতাস মাহমুদ

## প্রাক কথন:

দেশে শুনলাম গত কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। যে বৃষ্টিতে বন্যা হয়, তেমন বৃষ্টিতে কেবল একবারই ভিজেছিলাম আমি। ভিজে যাবার সে গল্পটা লাজুক লিখে রেখেছিলাম ডায়েরিতে। এমন হাজারো এলোমেলো চিরকুটে ভরে আছে ডায়েরির পাতা। যার কথা ভেবে চিরকুটগুলো লেখা, তাকে কখনোই এসব দেয়া হয়নি। মুখ ফুটে তাকে কোনোদিন বলাও হয়নি কী ভীষণ প্রেমিক ছিল একজন পুরুষ! প্রবল রক্তক্ষরণের পর কী আশ্চর্য! সে পুরুষটা অলৌকিক ভাবে আজো বেঁচে আছে। দেশে বুঝে বৃষ্টি হলে পরবাসী এই আমি পুরোনো সেই 'আমি' হয়ে যাই। পুরোনো ডায়েরি পড়ি, পুরোনো ছবি দেখি।

## চিরকুট ১৬৭ : মোনালিসা

তোমাকে হাসতে দেখেছি কিন্তু কাঁদতে দেখিনি। অবশ্য সব মিলিয়ে তোমাকে যে ক'বার দেখেছি, তা আমি আঙ্গুলের কড়ায় গুনতে পারি। কম দেখেছি বলেই হয়তো প্রতিটি দেখার কথা কী স্পষ্ট মনে আছে আমার! আমি তো শিল্পী নই। আর নই বলেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পোর্ট্রেটটি আজো আঁকা হয়নি। লেখাটির এইটুকু পড়েই, আমি জানি তুমি মোনালিসার মিষ্টি লাজুক হাসছো। হাসো, তবে নিশ্চিত জেনে রেখো, আমার না আঁকা পোর্ট্রেটের কাছে প্যারিসের মোনালিসা নিতান্তই তুচ্ছ।

তিন চাকার রিকশা ছিল আমাদের প্রিয় বাহন। শহরের নানা অলিগলি বেড়িয়ে সে রিকশাতেই আমরা বাড়ি ফিরতাম। একবার কী যে এক বৃষ্টি এলো! বৃষ্টি আমার সর্বকালের অসহ্য। বৃষ্টি এলেই সব পরিকল্পনা ভেঙে যায়। আমাদের মাথার উপর রিকশার ছাদ আর হলুদ রঙের পর্দা দিয়ে আটকানো হলো বৃষ্টির ছাঁট। অসহায় রিকশাচালক ভিজে একাকার। বাতাসের তোড় বেশী। দ্রুত প্যাডেল দিলেও চাকা এগোয় না। বিদ্যুৎ চমকায় আর হঠাৎ করে বুককাঁপা বাজ পড়ার শব্দ হয়! তুমি ভয় পেয়ে আমার ডান হাতটা চেপে ধরলে। সেটাই প্রথম এবং খুব সম্ভবত একমাত্র স্পর্শ তোমার! সেদিন থেকে বৃষ্টিকে আমি আর ঘৃণা করি না।

আমার নেমে যাবার সময় হলো। বাকিটা পথ তুমি একা রিকশাতে বাড়ি ফিরে যাবে। হলুদ পর্দার আড়ালে তোমার চোখের দিকে তাকালাম। রিকশার পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি ভিজে যাচ্ছি। বড় বড় বৃষ্টির ছাঁট তোমার চোখের নিচে জল হয়ে জমে আছে। তুমি অপূর্ব! তুমি অন্যরকম! তুমিই সেই মোনালিসা, পৃথিবী যাকে কোনদিন দেখবে না।

মাথার দিব্যি দিয়ে তুমি বললে বৃষ্টির জল না শুকিয়ে আমি যেন ঘুমুতে না যাই। আমি ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরছি। প্রবল বাতাসের ঠান্ডায় আমার শরীর কাঁপছে। অথচ আমি খুব চাইলাম, আজ আমার জ্বর হোক, ভীষণ জ্বর!



# The year 2019 through the eyes of BCS Executive Committee

*Taniya Talukdar*

Content: When the 2019 Executive Committee of the Bengali Cultural Society, Cleveland was selected, there were quite a few young and new faces. The lack of experience was made up by fresh ideas, enthusiasm and innovation. The end result was great as the committee members worked together to put up a great show for every event conceived. Here's a look at the highlights of the Executive Committee, 2019:

- Saraswati Pujo: With creative people at work, the Saraswati Pujo saw a great transformation this year. The mandap was set up in a particular theme which was of course to do with education. Giant cardboard pencils adorned the front of the deity while a giant slate made up for the backdrop. Apart from putting up an entertaining cultural performance, the children also participated in an art competition. Overall it was a successful event complemented with great food to keep up tradition.
- Somen Fundraiser: This was one-of-its-kind event that BCS organized this year. The executive committee hosted cyclist and globetrotter, Somen Debnath, who is on a mission to spread awareness about AIDs among the lesser privileged cycling around the world. A fundraiser evening saw Somen interact with BCS members in attendance and also share details of his journey. It was an interactive session and Somen answered questions posed by the audience. An amount close to \$2000 was raised for Somen's benefit.
- Baisakhi Sandhya: This is an annual evening that celebrates Kabiguru Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam and other contemporary Bengali artists. It was uniquely conceived, quite different from what the spectators saw in the previous years. The performances were categorized under themes of the five elements of nature and each theme had dance, recitation and singing. To optimize time and to keep audiences engaged, some of the dances and singing were clubbed together in a way that they depicted a story and was well received by the audience.
- Summer Picnic: One of the major achievements of the Executive Committee of 2019, is perhaps the revival of the BCS Summer picnic. The highlight of the event was the goat meat cooked by the EC Vice President, Ananya Biswas and team, that was liked and appreciated by all who attended this BCS sponsored picnic. Hosted at the scenic Hudson Springs Park, the picnic also had a lot of games to keep the young ones engaged and the adults entertained. It ended on a high note with everyone taking to the open air dance floor.

Our upcoming events for the rest of the year will see the same commitment and drive that the team has put up thus far. Our Durga puja celebrations will have a theme this year and the EC décor team has worked hard in collaboration with a few other BCS members to set up an exclusive mandap with the limited resources at hand.

Some of our other upcoming presentations are: Lakshmi Puja, Bijaya Sammilani and a Christmas party to end the year with.

In addition to the above preplanned mentioned events, we're also looking to organize a donation drive to give back to the community that we live in. Anyone and everyone is welcome and encouraged to take part in this drive where BCS EC members will collect old clothes, books, school items, non-perishable food items and donate them to a particular chosen NGO. Please stay tuned for more details.

We thank each and every BCS member for their support and encouragement in the success of the Executive Committee of 2019.

# আমেরিকায় বাঙালিয়ানা

সুদেষণা বিশী

এক যে আছে দেশ - নাম তার আমেরিকা। পঞ্চাশটি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। প্রতিদিন বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ স্বপ্ন পূরণের হাতছানি নিয়ে পাড়ি দিচ্ছে সেই দেশে। ভারতীয়রাও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের আনাগোনা চলে প্রতিদিন। বঙ্গসন্তানের সংখ্যাও এখানে নেহাত মন্দ নয় - আনুমানিক বিশ হাজারেরও বেশি বাঙালি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পুরো দেশ জুড়ে। মনে প্রশ্ন আসে যে কি এই মোহ যার টানে অগুণতি মানুষ নিজের মাতৃভূমি থেকে পাড়ি দিয়েছে এখানে - সে কি সুযোগ এর আশা, স্বপ্নপূরণ এর হাতছানি, বিলাস বহুল জীবনের আকাঙ্ক্ষা, কর্মের উন্নতি, স্বাধীনতার আশ্বাদ, উচ্চশিক্ষায় নিজেদের পরিপূর্ণ করা, অর্থ উপার্জন এর তাগিদ, জীবন উপভোগের দুর্নিবার আকর্ষণ? প্রতিনিয়তই মনের ভিতরে সৃষ্টি হয়েছে একরাশ প্রশ্ন আর হয়তো নিজের অজান্তেই গোপনে যত্ন করে সাজিয়ে নিয়েছি সেই উত্তরগুলোকে।

আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে আমিও তো নিজে এমন একজন বাঙালি যে একসময়ে এসেছিলাম সুদূর ভারত থেকে। নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে টিকে রয়েছি লক্ষ লক্ষ বহিরাগতদের সঙ্গে, অভ্যস্ত হয়ে গেছি দেশের নিয়ম শৃঙ্খলাতে, খানিকটা রপ্ত করে নিয়েছি স্থানীয় খাবার দাবার, উৎসব ও সংস্কৃতিকে, কিন্তু নিজের ফেলে আশা অতীতের স্মৃতি কে পুরোপুরি মুছে দিতে পারিনি। মাঝে মাঝেই হাতড়ে বেড়িয়েছি ভারতে ফেলে আসা দিনগুলোকে।

মনের মধ্যে চলেছে দ্বন্দ্ব, প্রশ্ন এসেছে কোনটা ভালো - ফেলে আশা অতীত নাকি আমার বর্তমান জীবন? আবার এক লহমায় অবসান হয়েছে দ্বন্দ্বের। মনের ভিতরে বলে উঠেছি "এই বেশ ভালো আছি"। কি সুন্দর আমেরিকা! বিশাল ব্যাপ্তি, হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলি অরণ্যকে, দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ। প্রকৃতি অপরূপ ভাবে সাহায্য করে চলেছে এই দেশের নদী, নালা, খাল, বিল, পাহাড় পর্বতকে! মনে পরে যায় আমার এখানে আসার প্রথম দিনগুলির কথা। অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম সারা বছরই কি শরৎকাল - নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা?। প্রতিটি ঋতুপরিবর্তনই কি এতো গোছানো?। শীতের হিমশীতল রাতগুলোর নিস্তরতা যেন শার্লক হোমসের থ্রিলার গল্প, বসন্ত যেন পৃথিবীর ক্যানভাসে ঢেলে দিয়েছে সবুজ রং - মনে পরে রবীন্দ্রনাথ এর "যেন চল-চঞ্চল নবপল্লবদল মর্মরে মোর মনে মনে", গ্রীষ্মের বাঁধনছাড়া উল্লাসে পূর্ণিমার চাঁদ বলসানো রুটি তো নয়, হেমন্তের রং যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

এখানে তাহলে কি কোনো দুঃখ জীবন কে ছুঁতে পারে না? এতো প্রাচুর্যের মাঝে কখনো কি বিষন্নতা আসতে পারে না? আবার আমার হাতড়ানো শুরু হয় অতীতের - ফেলে আসা আমার পাড়ার গলি, মাটির গন্ধ, প্রিয়জনের সঙ্গ, বন্ধুদের সাথে হটোপাটি, বারো মাসের তেরো পার্বণ, পারিবারিক উৎসব, স্থানীয় বিনোদন। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলার বিরতি হয় না - এ যেন বুদ্ধদের আলোড়ন! আমি ভাবি কেন এতো প্রাচুর্যের মধ্যেও বারবার পুরাতনকে মনে হয় - আমি কি তাহলে ব্যতিক্রমী? নৈরাশ্যবাদী? প্রাচীনপন্থী - যে কেবল অতীতকে আঁকড়েই পরে থাকে? বর্তমানের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে চায় না? বিজ্ঞানমনস্ক নই? হয়তো তাই এই স্বগতোক্তি! নিজের এই অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করে বলেছি - "আমাকে পাল্টাতে হবেই, যুগের প্রয়োজনে নিজের সংস্কারকে বদলাতে হবে, যেখানে যেমন তেমন ভাবেই মানিয়ে নিতে হবে, অতীতের কথা ভেবে বর্তমানকে ম্লান হতে দেয়া যাবে না"। যতই দিন কাটতে থাকেছে, নিজস্ব গতিতে অপরিচিত গন্ডিকে পরিচিত করে নেওয়ার ইচ্ছেশক্তি বাড়তে থাকেছে। এক বছর সময় অতিবাহিত হতে না হতেই দেখি আমার চেনা গন্ডির এক বিশাল ব্যাপ্তি হয়েছে। কত ভারতীয় বন্ধু আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে - আজ আর আমি নিঃসঙ্গ নই, বাড়তে থাকেছে মানুষের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা, তৈরী হয়েছে পারিবারিক বন্ধুত্ব, সুখ দুঃখ ভাগ করে নেবার সাথী।

কর্মসূত্রে ও পারিবারিকসূত্রে বিভিন্ন সময়ে আমেরিকায় নানা জায়গায় অনেক স্থায়ী ও অস্থায়ী বাঙালি বাসিন্দাদের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। কি ভীষণ আশ্চর্য্য মিল - ক্রমশ বুঝতে পেরেছি সেই মানুষগুলোর মনের মধ্যেও একই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করে! একটা গাছের শিকড় যেমন মাটির গভীরে যায় আর তার ডাল পালা গুলো মাটি থেকে বহু দূরে আকাশের পানে মেলে থাকে, আমাদের অবস্থাটাও ঠিক এমনই। নিজের শিকড় থেকে যেন বহু দূরে! তারাও ভাবে কবে দেশে যাবে?। কতদিন ইলিশ মাছ ও মিষ্টি দই খাইনি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খাইনি, বিশ্বকর্মা পুজোয় মাংস-ভাত খেয়ে ঘুড়ি ওড়াইনি, কতদিন দোকানে গিয়ে জমিয়ে শাড়ী কেনা হয়নি, ফুটপাথে দরদাম করে লেডিস হ্যান্ডব্যাগ কিনিনি... আবার আমার অনুসন্ধানী মন বলে উঠেছে "তাহলে তো অনেকেই আছি

আমরা যারা আমেরিকায় বসে আমাদের ফেলে আসা স্মৃতিগুলোকে খুঁজে মরি"!

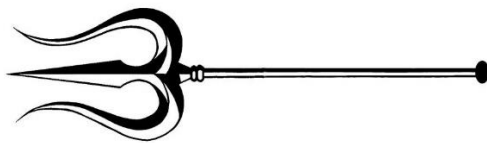
সময়ের সাথে আমরা হয়ে উঠেছি পরিণত মনষ্ক ভারতীয় তথা বাঙালিরা অলিখিত শপথ নিয়েছি - নিজেরাই ফিরিয়ে আনবো বাঙালিয়ানা এই আমেরিকার মাটিতেই, অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি "তেরো পার্বণ" উদযাপনের, একে অপরের সাথে বাঁধা পড়েছি বন্ধুত্বের মন্ত্রে, বিপদে আপদে হয়ে উঠেছি আত্মীয়. হয়তো নাই বা পেলাম রাস্তার ধারে এগরোল, নাই বা পেলাম শুনতে দুর্গা পূজোর প্যাণ্ডেলে কিশোর কুমার বা কুমার শানুর পূজোর গান, নাই বা গেলাম ম্যাডক্স স্কয়ারে এ দুর্গাঠাকুর দেখতে...

নিজেদের ভালো থাকার তাগিদে এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গ-সংস্কৃতির বীজ বপন এর দায়িত্বে আমরা এই বাঙালিরা কি অদম্য প্রচেষ্টা করে চলেছি সেই কথাই বারবার মনে আসছে লিখতে বসে। আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে বাঙালি সংগঠন যারা দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজো পালিত হয়ে চলেছে বছ বছর ধরেই। কালীপূজো অথবা দীপাবলিও এর ব্যতিক্রম নয়। শুধু বাঙালি বলবো কেন - ভারতের প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষেরাই তাদের নিজস্ব লোকাচার ও উৎসব পালন করে চলেছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাঙালি উৎসবগুলো আরো পরিপূর্ণতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছে - দুর্গাপূজোয় এসেছে থিমের ছোঁয়া। দুর্গাপূজোর আয়োজন এ মন্ত্র পাঠ করা, নৈবেদ্য সাজানো, পূজোর ফল কাটা, ভোগরান্না করা, পরিবেশন করা, দশমীর দিনে মা কে বরণ করে সিঁদুর খেলা - সবই যেন নিপুণ ভাবে পালন করে চলেছি। শুধু কি দুর্গাপূজো - বার্ষিক অনুষ্ঠান এ স্টেজ সাজানো, নাটকের রিহাসাল দেওয়া, কিশোর কিশোরীদের দিয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা, বাংলা নববর্ষের আড্ডা, ভোজনরসিক বাঙালির রসনাতৃপ্তির আয়োজন এক অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেয়। বারোয়ারি পূজো হিসেবে লক্ষ্মীপূজো, সরস্বতীপূজো ও পালিত হচ্ছে। দূর দূরান্তের বাঙালিরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হচ্ছে - শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, গ্রীষ্মকালের চড়ুইভাতিতে সবাই মিলে কোমর বেঁধে লুচি-তরকারি, পাঁঠার মাংসের ঝোল রান্না করার আনন্দ ভাগ করে নিয়েছি। দুর্গাপূজোয় সাংস্কৃতিক সাক্ষ্যঅনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা পেয়েছি সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি ও আরো নানারকম শিল্পকলা প্রদর্শনের সুযোগ। পালিত হয় রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ... কত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা ভাষা শিক্ষার পাঠশালা। এইগুলো যেন আমাদের সকলের জীবনে কিছু অভাববোধকে মুছে দিয়েছে। দূরে থেকেও যেন শিকড় এর কাছাকাছি রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির ভূমিকা মনে রেখে পনেরই অগাস্ট গলায় গলা মিলিয়ে গান গেয়েছি "মুক্তির মন্দির সোপানতলে..."। শুধু কি নিজেরাই আনন্দ উপভোগ করেছি? পরবর্তী প্রজন্ম যারা এদেশের মাটিতেই জন্মেছে, যাদের বাঙালি সংস্কৃতি বোঝার তেমন সুযোগ আসেনি, তাদের কাছেও আমরা পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছি। কোথায় যেন এগুলো আমাদের মনে তৃপ্তির স্বাদ এনে দেয়, অনেক অচেনা মানুষ নিকট হয়ে যায়। তাই যেন "অনেক ছেড়ে অনেক পেয়ে চলেছে বাঙালি জীবন"।

এক দায়িত্বশীল সচেতন মানুষ হিসাবে ভাবি তাহলে কি আমরা সার্থক হয়েছি প্রবাসে থেকেও নিজেদের সংস্কৃতির বীজ বপন করতে পেরে? তাহলে হয়তো আমরা পারবোই এই পরম্পরা ধরে রাখতে! শুধু আমাদের মনে রেখে তুলে দিতে হবে এই গুরুদায়িত্ব। আগামী প্রজন্মকে, বোঝাতে হবে জন্মসূত্রেই হোক বা কর্মসূত্রেই হোক আমেরিকার স্থানীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করলেও নিজের শিকড়ের কাছে থাকার মধ্যে কিন্তু কোনো পারস্পরিক বিরোধ নেই - দুই সাদরে গ্রহণ করা যায়!

এই দেশের মাটিতে থাকা প্রতিটি ভারতীয় তথা বাঙালিদের আমি আন্তরিক ভাবে সাধুবাদ জানাই - তাদের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে তারা শুধু সংস্কৃতির ধ্বজা তুলে ধরেননি, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সংস্কৃতির বাহক ও ধারক হয়ে উঠেছেন।

আমার আজকের এই লেখার প্রচেষ্টা তাদের উদ্দেশ্যে এক শ্রদ্ধার্ঘ্য মাত্র।





# Robots for Medical Interventions and Treatments

Tarun K. Podder, PhD

Professor

Department of Radiation Oncology

Department of Biomedical Engineering

University Hospitals Seidman Cancer Center

Case Western Reserve University

Cleveland, Ohio

It is not uncommon to have curiosity about robots. One may envision a robot as a human like or even a superhuman or human. In this context, let's see what is meant by a robot. The best or comprehensive definition of a robot is - "A robot is a reprogrammable multi-functional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices, through variable programmed motions for performance of a variety of tasks" [ref. 1]. It is interesting to notice that if we go with this formal definition of "robot", a drone or a crane or even a car (especially Google Self Driving cars) can be considered as a robot! Robots can have a variety of shape, size, design, functionality and application (Figure 1). However, the common main components of any robot are: (a) linkages/mechanisms, (b) motors/actuators, (c) power supply (d) encoders & sensors, (e) CPU/computer, and (f) control system (algorithms & software etc.).

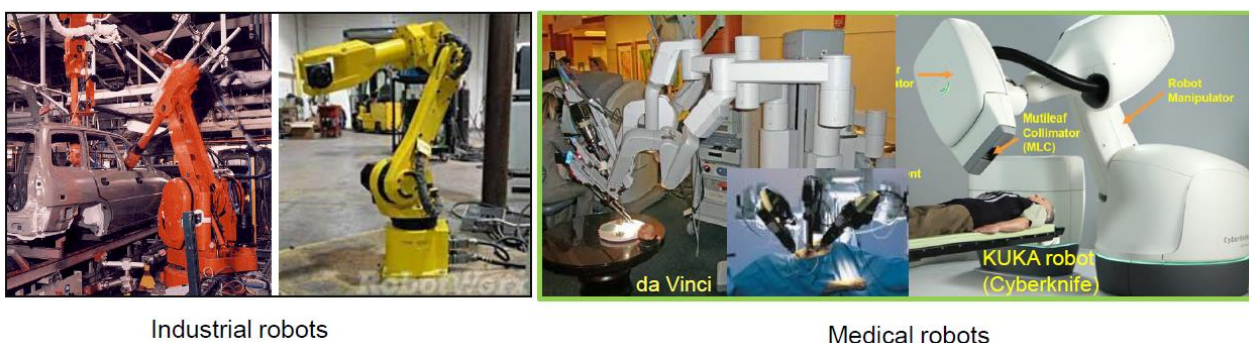
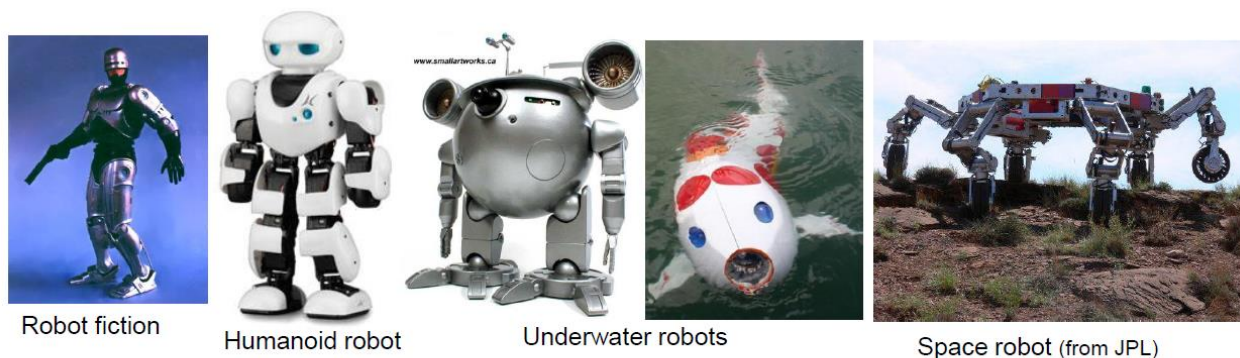


Figure 1: Example of different type of robots.

The Robotics Institute of America (RIA) has categorized robots in four classes as follow.

- Class 1:** Devices that manipulate objects with manual control,
- Class 2:** Automated devices that manipulate objects with predetermined cycles,
- Class 3:** Programmable and servo-controlled robots with continuous point-to-point trajectories, and
- Class 4:** Devices that also acquire information from the environment and move intelligently in response.

However, considering large field of applications, robots may be categorized as: (1) industrial robots (assembly line, welding, material handling, etc.), (2) space robots (exploration, repair, maintenance, etc.), (3) underwater robots (data collection, rescue, repair, etc.), and (4) medical robots (surgery, rehabilitation, biopsy, radiotherapy, etc.). Nevertheless, space robots can be deemed as a subset of underwater robot, so far, the dynamics and control complexity are concerned; similarly, medical robots can be of thought a subset of industrial robots. In the following sections let's focus on relatively

newer category of robots, i.e. medical robots. The main application of robots in medical field include surgery, biopsy, rehabilitation and radiotherapy.

**Robotic-assistance in Surgery:** In Robot-assisted Laparoscopic Surgery (RALS), two to four long operating devices/tools and a high-resolution endoscopic camera are placed near the target location through multiple small incisions in the patient's body. The surgeon sits at a panel near the operating table and controls the master robotic arm at the console while the slave robotic arms (three to four arms, depending on the model) holding the operation instruments follow the movements of the master robotic arm (da Vinci robot in Figure 1). The motion/posture of the surgeon's figure/hand is precisely copied by the master robot and subsequently transferred to the slave robot for executing the surgery. The video feedback to the surgeon through the endoscopic camera is very important for the success of the procedure. The teleoperated robotic system (master-slave robots) should have minimum possible latency, so that the slave robot response immediately to the surgeon's intended movement through the master robot. Reduced blood loss, faster recovery, shorter hospital stay, and potentially better clinical outcome are some of the benefits of RALS.

**Robotic-assistance in Biopsy:** In biopsy, positional accuracy of the needle and architectural integrity of the tissue sample is very important. In this context the robot can assist the clinicians in improving needle insertion accuracy and sample collection. Some of the robots designed for collecting biopsy samples are shown in Figure 2.

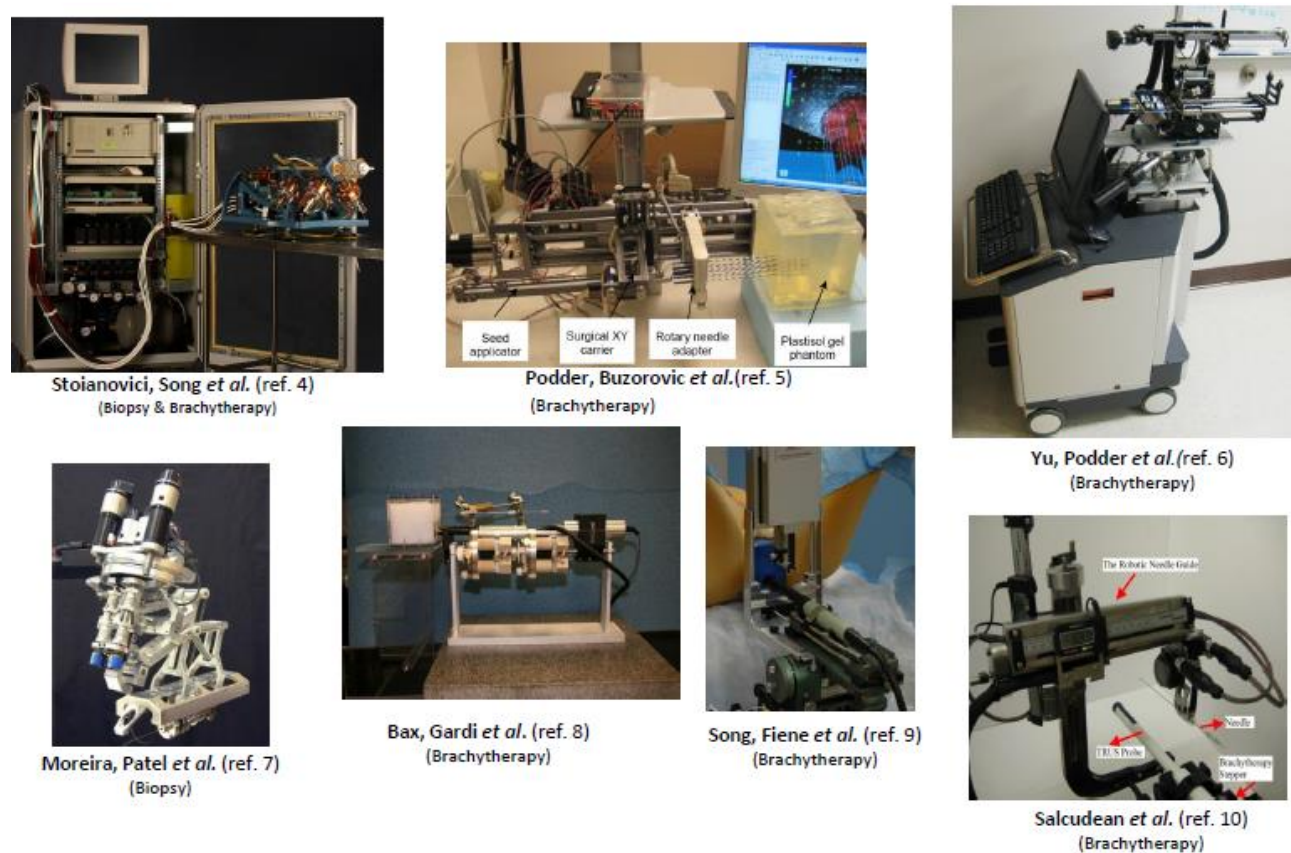


Figure 2: Example of some robots designed for biopsy and brachytherapy procedures [ref. 2].

**Robotic-assistance in Radiotherapy:** In robotic *external beam radiation therapy* (EBRT) a compact radiation source is mounted at the end-effector of the robot. The radiation source can be a linear accelerator (Linac) that can generate very high energy X-rays (6-20 MV) for cancer treatment. Then the compact Linac is moved around the patient to deliver treatment dose as per radiation treatment plan. One such machine that dose that is the Cyberknife, which has a 6 MV X-band Linac installed at the end-effector of a 6 degree-of-freedom (DOF) KUKA robot [ref. 3, Figure 1]. Cyberknife uses a pair of orthogonal X-ray imaging systems for tracking a moving tumor and delivering radiation dose to target tumor volume. Generally, stereotactic body radiotherapy (SBRT) and stereotactic radiosurgery (SRS) type of treatments, where tumor motion and treatment accuracy are very critical due to the high radiation dose per fraction (8-20 Gy), are performed with a Cyberknife robotic system.

**Brachytherapy:** Unlike EBRT, in brachytherapy the radiation source is either permanently or temporarily placed in or very close to the tumor. Therefore, positional accuracy of the radioactive source is very important for optimizing the dose delivery to the targeted tissues (i.e. tumor) sparing the adjacent critical organs and normal tissues. But accurate steering and placement of surgical needles/catheters and radioactive sources in soft tissues are challenging because of tissue heterogeneity and elastic stiffness, unfavorable anatomy, needle bending, inadequate sensing, tissue/organ deformation and movement, poor maneuverability, and change in dynamics of various organs. A robotic system, with enough DOFs, can provide flexibility in positioning and orientating along with improved accuracy of the needle/catheter insertion and source deposition [ref. 2, figure 2]. Robot assisted delivery of therapeutic agents (radioactive source, drug, gene, etc.) is attractive for several reasons. The main advantages are increased accuracy, reduced human variability, reduced clinician's fatigue and possible reduction of operation time. Additionally, with the assistance of a robotic system, less skillful surgeons/clinicians may be able to treat patients with higher quality, which can result in improved clinical outcome.

**Patient Positioning:** Accurate and repeatable positioning of patient during EBRT is extremely important. Generally, a 6 DOF robot with a flat table-top installed at the end-effector is used for the patient to lay down for accurate positioning under the treatment beam. In many cases, the patient is held horizontally and depending on the tumor location and relative motion, the table-top or couch can be tilted and/or rolled to a certain angle. A 6 DOF orthomorphic arm type robotic couch is commonly used with Cyberknife and Proton Therapy machines. Whereas, a 6 DOF HexaPOD robotic couch is mainly used with conventional Linacs.

**Robotic-assistance in Rehabilitation:** The application of robots in rehabilitation or domestic help for older people is growing. Robots can assist in routine exercise, walking or executing desired tasks (Figure 3a). Incorporation of computer-brain interface can immensely benefit the rehabilitation robots, i.e. ideally, the computer will read the mind/brain and accordingly will instruct the robot how to move so that the desired goal is achieved.



Figure 3: (a) Robot for rehabilitation, (b) robot can work hard!!

Generally, robots are best suited for performing dull, dangerous and dirty (3Ds of robot) tasks. They can work hard (Figure 3b)! The field of robotics is relatively matured, however, the incorporation of artificial intelligence (AI) and integration of advanced sensory system as well as smart control algorithms are still evolving to make the robot like the one mentioned in **RIA Class 4** and beyond.

### References:

- [1] K. S. Fu, R. C. Gonzalez and C. S. G. Lee. *ROBOTICS: Control, Sensing, Vision and Intelligence*. McGraw Hill International, New York, (1988).
- [2] T. K. Podder, L. Beaulieu, B. Caldwell, R. A. Cormack et al. AAPM and GEC-ESTRO Guidelines for Image-guided Robotic Brachytherapy: Report of the Task Group 192. *Medical Physics*; 41:101501-1-27 (2014).
- [3] M. Hoogeman, J. Prévost, J. Nuytens et al. Clinical Accuracy of the Respiration Tumor Tracking System of the Cyberknife: Assessment by Analysis of Log Files. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*; 74: 297-303 (2009).
- [4] D. Stoianovici, D. Song, D. Petrisor, et al. MRI Stealth Robot for Prostate Interventions. *Minim Invasiv Ther Allied Technol*; 16: 241-248 (2007).
- [5] T. K. Podder, I. Buzurovic, and Y. Yu. Multichannel Robot for image-guided brachytherapy. *IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (BIBE)*, Philadelphia, PA; 209-213 (2010).
- [6] Y. Yu, T. K. Podder, Y. D. Zhang et al. Robotic System for Prostate Brachytherapy. *MICCAI 2006 and Comput. Aided Surg*; 12: 366-370 (2007).
- [7] P. Moreira, N. Patel, M. Wartenberg et al. Evaluation of Robot-assisted MRI-guided Prostate Biopsy: Needle Path Analysis during Clinical Trials. *Phys. Med. Biol.* 63: 20NT02 (9pp) (2018).
- [8] J. Bax, L. Gardi, J. Montreuil et al. A Compact Robotic Apparatus and Method for 3-D Ultrasound Guided Prostate Therapy. *Proc. SPIE*; 6509 (2007).
- [9] D. Y. Song, E. C. Burdette, J. Fiene et al. Robotic Needle Guide for Prostate Brachytherapy: Clinical Testing of Feasibility and Performance. *Brachytherapy*; 10: 57-63 (2011).
- [10] S. E. Salcudean, T. D. Prananta, W. J. Morris et al. A Robotic Needle Guide for Prostate Brachytherapy. *IEEE Int Conf on Robotics and Automation (ICRA)*, New York, NY; 2975-2981 (2008).



# বিবর্তন

ড. আতিউর রহমান বুলবুল

সাগর জলে জীবন দিল দেখা  
বিবর্তনের ধারায় হল খাঁটি  
সবুজ প্রাণে জাগল বনতল  
ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাথর হল মাটি  
ধ্যানে জ্ঞানে মানুষ হল বড়  
ভুলল আছে বাঁধা...সীমারেখা তারও ।

জীবন ধরে রাখছে পৃথিবী  
মাখছে দূষণ তারই হাওয়া জল  
জমছে বিষ মাটির শিরায় শিরায়  
শস্য দানা নিচ্ছে শুষে সব  
সমান্তরাল প্রতি ভাঁজে ভাঁজে  
যত্নে সাজায় চিহ্ন মাটির কনা  
মহাকালের আসা যাওয়া ক্ষত  
সবই হিসাব রাখছে বুক জমা ।

পৃথিবী আজ বদলে যেতে চায়  
গায়ের তাপ বাড়ছে দিনে দিনে  
সাগর ক্রমে করছে ভূমি গ্রাস  
ঝড় ফুঁসছে চাঁপা অভিমানে ।

হাল ছেড়েছে মানুষ কালের খেয়ার  
সভ্যতারই ভয়াল অভিশাপে  
প্রতিশোধ নেবেই পৃথিবী  
প্রাণের দাবী উঠছে কেঁপে কেঁপে  
মানুষ নাকি অতীত গেছে বুঝে  
বর্তমান যে অতীত ছাড়া নয়  
ঢালছে বিষ দিনের প্রতি কাজে  
শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ অভিনয় ।

# পাগলি আমার

বর্ষগজিৎ মজুমদার

পাগলিরে তুই আজকে কেন বৃষ্টি নামাস বুকু ?  
তোর দুই ঠোঁটেতে স্বপ্ন চুরি, রিক্ত আকাশ সুখে।  
পাগলি আমার সকাল বিকেল তেলচিটে গামছাটা  
আমি চোখ বুজলেই দেখছি যে তোর উড়ন্ত ওড়নাটা।  
পাগলিরে তুই তোর সাথে চল ভিজবো অন্ধকারে  
আমি তোর খোপাটার ক্লান্ত পলাশ, আজকে যাবোই ঝরে।

পাগলি কি তুই সত্যি আজো সুখের ছবি আঁকিস  
তুই কি আজো সেই মেয়েটা? সত্যি চেয়ে থাকিস?  
পাগলিরে চল ওই নদীতে ডুবসাঁতারই কাটি,  
তোকেই বনলতা ভেবে হাজার বছর হাঁটি।  
পাগলি আমার!! দেখ চেয়ে দেখ, পথটাই গেছি ভুলে,  
কলমটা তাই পড়ছে ঘুমিয়ে মরণ হেঁচকি তুলে।



# অসমাপ্ত

## ব্রতী ভট্টাচার্য

সে যেন আমার কোন জন্মের কথা,  
সেবার আষাঢ়ের প্রথম রাতে  
আমাদের দল বেঁধে  
জঙ্গলে রাত্রি যাপন।  
শুশুনিয়ার পাহাড় জুড়ে  
অতিলৌকিক আলোতে, তার সাথে প্রথম আলাপের সন্ধিক্ষণ।

চাঁদ আর ঝোড়ো মেঘের লুকোচুরি  
কান পাতলে শুকনো পাতার ব্রহ্ম আওয়াজ  
হায়নার হাসি বারবার ছিঁড়ে ফেলেছিলো  
জঙ্গলের ঝুপস তীব্র অন্ধকার।  
হয়তো ঠিক তখনই সব ছাপিয়ে তার ukulele-র সুর,  
আমায় ছুঁয়েছিলো।

শরীর জুড়ে মছয়ার মাতাল গন্ধের মতো উচ্ছ্বাস  
কোন দূরে মাদলের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি  
আবার মেঘের ছায়া, শালবনে উতল ঝড়:  
আশ্চর্য উষ্ণতায় হয়তো তখনি তার হাসি,  
আমায় ছুঁয়েছিলো।

ঘর জুড়ে যখন আলতো আবছায়া  
ক্রমে বাইরে বেড়েছে উদ্দাম বৃষ্টি  
গল্প গান কথার ফাঁকে সেই চোখ  
অকারণে ছুঁয়ে গেছে কতবার আমায়,  
সেদিন সে যেন আমায়,  
আমার চেয়েও চিনেছিল বেশি।

তাকে চিনতে তারপর আমিও ঘর ছাড়া...

এরপর কত কাল হোলো আজ  
নিবিড় নৈঃশব্দ্য গ্রাস করেছে আমাদের  
দুজনের মাঝে উপত্যকার দূরত্ব,  
শূন্যতার খাঁ খাঁ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে  
জ্বলছি একাই।

সময় অসময়ের যোগ বিয়োগের মাঝে,  
সেই মুহূর্তের সত্যি গুলো মিথ্যে হয়েই থাক ।

# লক্ষী\*

## পিনাকী রঞ্জন চক্রবর্তী

ছোট্ট মেয়ে নাম ছিল তার লক্ষী,  
আসা যাওয়ায় সে ছিল খুব চটকি,  
হাসির মত হাসতে সে যে জানতো,  
তাই তো সবার তাকে ভালো লাগত /

বড় হবার তাগিদ ছিল বেশী,  
তাই তো শাড়ি কুঁচিয়ে পরেই খুশি /  
লিখতে না হয় শিখবে কখন পরে,  
বলতে কথা নাই যে তার তরে /

ইস্কুলেতে সবার প্রিয় সে যে,  
পড়ার ঘরে, খেলার মাঠে,  
মাস্টার আর সবার ঘরে,  
যাতায়াত তার সদাই যে আজ আছে /  
সময় তার একটুও নেই হাতে,  
প্রতি দিনের ছাত্রী জীবন ব্যস্ততাতেই কাটে /

হঠাৎ কখন স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে,  
ছমড়ি খেয়ে কলেজ পাড়ায় থামে /  
সেখানেতে সঙ্গী অনেক মেলে,  
বিশেষ করে একটি নতুন ছেলে /



## বার্ষিকী

সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)

কিছু পিছুটান ভালোলাগা হয়ে রয়ে যায়  
কিছু অনুরাগ অকারণে মন ছুঁয়ে যায়  
দমকা হাওয়ায় হেঁড়ে কালো মেঘ, হাসে রোদ  
বিষাদের ঋণ খুশী দিয়ে হয় শোধবোধ

তেমনি করেই তোমার আমার পরিচয়  
ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা হয়ে অক্ষয়  
হয়েছে। এখন শপথ মোদের চিরদিন  
দুঃখে ও সুখে রেখে দেব তাকে অমলিন

ছায়াছায়া কিছু সংশয় যদি কুয়াশা  
ছিঁড়বেই তাকে দুর্দম যত দুরাশা  
চেনাচেনা সুর, চেনা গান আর চেনা গং  
পিছে পড়ে থাক -- ছুঁতে হবে ওই ছায়াপথ

সেই অজানায় পাড়ি দিতে দিতে হয়তো  
ভুল হবে পথ, জাগবে হৃদয়ে ভয় তো  
তবু জেনো এই স্বপ্নটা মরীচিকা না  
প্রেমের আলোয় খুঁজে নেবো মোরা ঠিকানা

তার আগে প্রিয়ে বাকী রয়ে গেছে কিছু কাজ  
তোমার আমার মিলনের বার্ষিকী আজ  
পূর্ণিমা চাঁদে চরাচর দেখো সিন্ত  
আজ আমি তোমাতে ডুব দিয়ে হবো রিক্ত

চুপিচুপি রাত ইশারায় ডাকে জানলায়  
একা একা ছাদ জেগে আছে মোম-জোছনায়  
দুটি হৃদয়ের নীরবতা শুধু ভাষা চায়  
চোখে নেই ঘুম, স্বপ্নেরা তবু আসে যায়

## কবিতার আসাযাওয়া

সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)

আয়োজন করে, আসর সাজিয়ে কবিতাকে যত ডাকি --  
সে দেখি কেবল পালিয়ে বেড়ায়, বারেবারে দেয় ফাঁকি।  
দু-চোখে যখন না-বলা কথারা ভীড় করে দলে দলে --  
দু-ঠোঁটের মৃদু কাঁপনে হৃদয় তখন কবিতা বলে।

কত মাত্রার ছন্দে লিখেছো? পয়ার? অনুষ্টুপ?  
বিতর্ক চলে তাত্ত্বিকদের, কবিতাই থাকে চুপ।  
তর্কের শেষে সন্ধ্যা ঘনায়, একফালি চাঁদ ওঠে --  
শ্বেতকরবীর কুঁড়িতে কুঁড়িতে হঠাৎ কবিতা ফোটে।

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বায়রন, কীটস, শেলী --  
সারাটা জীবন মহাকবিদের জীবনী-ই পড়ে গেলি?  
বুঝলি না হয় কবিতা থাকেনা লিটারেচারের ক্লাসে?  
মনের আকাশে মেঘ করে এলে তবেই কবিতা আসে।

বড় বড় সব প্রকাশনী, নামী কাগজে প্রচুর টাকা --  
দশটা-পাঁচটা কবিতা লেখার চাকরিটা হোক পাকা।  
অর্ডারি লেখার বাজারেতে চলে কবিতার কেনাবেচা --  
ঝিনুকের খোলে ভরে শুধু হাত, মুক্তো হয়না ছেঁচা।

হৃদয়সাগরে ডুব দিয়ে দেখো, কান পাতো অন্তরে --  
হয়তো বা কোনো মায়াবী সকালে কারও জাদুমন্ত্রে  
খুলবে মনের বন্ধ দুয়ার, কত রঙে কত ছবি  
আঁকা হবে অনুভূতির তুলিতে -- জন্মাবে এক কবি।



## An Ode to My Beloved Daughter- Pihu

*Taniya Talukdar*

My baby, my daughter - you're the reason behind my laughter.  
You make me so happy and content, it feels like a priceless present.  
You're the seed planted in me to experience love as big as the sea.  
You're my heart, you're my soul - your absolute joy is my goal!  
You're now my inspiration to overcome any difficult situation.  
You make me want to be a better person while teaching each day a valuable lesson.

You showed up as a miracle for nature to unravel.  
As you grew inside me so did my family.  
I felt your heartbeat in unison with mine and baby, the feeling was divine.  
Our journey together is like no other, I am so proud to be your mother!

You showed up at the end of the night, yet everything was shining bright.  
Nothing can describe how I felt when they first placed you on my chest.  
Sleepless nights didn't matter because it was all for my darling daughter.  
You brought excitement to your grandparents and everyone wanted to freeze that very moment.

You're in such a hurry to grow up that I think I need a backup.  
I want time to stand still and serve me a refill.  
No matter how big you grow, my love for you will always overflow.  
I see myself when I look at you, how did I get so lucky, I have no clue!

May you grow up to be a good human being who's helpful and kind and is always on everyone's mind.





## Bong Connection

*Siddhant Sarkar (11th grade)*

Before you get into this article, please, dear reader, think to yourself, what is a Bengali? What makes a Bengali? These questions entrap me in a series of deep thought every day, I am serious, while I am eating fish and rice, Kachori (of course Bengali style), and other items that seduce the tongue and stab the stomach. If you're noticing a pattern between the activities and the occurrence of my deep thoughts already, congratulations, you are already closer than I was a few weeks ago to figure out the answer.

As a fellow Bengali, I am not at all a typical specimen, but I do have a few traits that pin me to my roots. I don't eat fish, but I like to eat in general. I don't like to play, but I love commenting on the player's mistake. I am unathletic, but I do go to the gym even if it is for the show. Enough about me, as I am not the subject of this piece of text, nor am I the perfect example of Bengali you'll find!!

Bengalis throughout India are known as "conversationalists", by that I mean two things, one good and one slightly towards the negative side. We disagree on many things, is Didi good or is she bad, should I make my child focus more on arts or academics? And other personal/ public disputes, we bong have. However, have you noticed something? Yes, we Bongs LOVE to talk, we comment on everything, from politics to the neighbor's personal life. Bengalis have an opinion which they're not afraid to reveal to the world.

Conversations connect, right? Let's have the Bong's famous topic of conversation of the year: Durga Puja! This is the time when all our conversations revolve around the planning, shopping and execution of the event. This is the time when all Bengalis bury their differences and come as one big family and connects all Bengalis across the world.

Many Pujas across India are to be confused with the Durga Puja, like Navratri and Annapurna Puja. However, there are BIG differences between them. While most people starve themselves during the few days of Navratri and then eating a small amount of veg. food, Bongs stuff themselves all days of the puja with Biryani, Mangsho Kosha, Eggplant fry, etc. For us our Durga Puja is not just a religious festival, it's a culture. We don't focus on the deities alone but celebrate the true joy they bring to our hearts when we enjoy the days of the puja to the fullest of our imaginations.

Despite what anyone might say about Bengalis, I must say, I am, will be and have always been proud to be a Babu Moshai!

May everyone who is a Bengali, be proud and enjoy the Durga Puja!



# Mystery Magic

*Rajonya Pramanik*

*7th Grade*

## 1: Mystery Place

Every person has dreams and secrets. Everyone does. But my dream is a little different. I want to be a magician.

It sounds childish and crazy but it's true. My likings are different. But I was just like any other kid that is until my grandpa's funeral. During the funeral I was very excited for it to end. When it would I would get to see the room on the back of the terrace where my grandpa made magic. Real magic or not I don't know, but magic. Ever since I was little, I was told not to enter that room because grandpa would be angry. So sometimes I would sneak a peek into his...mystery place. But I never got to see anything because there was another wooden door after the first one and it was always locked from inside.

However, my grandpa had promised me that after he passed away, I could enter that room. So that is why I was so excited during the funeral.

## 2: Wonderland

When the funeral finally ended after what seemed like hours my dad gave me the key and said, "All your excitement will be drained after you see that mess." I did not bother to reply. I ran up the stairs to the terrace and stood in front of the wooden door as my heart practically jumped out of my chest and I turned the key.

After I opened the door, I was a little disappointed. The place was messy, extremely messy to be honest. For a moment I thought that maybe dad was right but then I stepped closer. There were coins and handkerchiefs and hats and even a few pigeons in cages. I went closer to the plastic desk my grandpa worked on and saw a video camera lying on there. I started to see the videos and that is when I decided I wanted to be a magician.

Those videos were unbelievable. There was one when my grandpa put a live person in a box and then held the box upside down over his head and when he opened the lid the person was gone. Then he put the box on the ground and brought that person back. Then there were easier ones like balancing a coin on the edge of his handkerchief or getting a bunny out of his hat. Overall, the moment I saw the videos and tricks I fell in love with magic. I loved the coin tricks more than anything. From that day I knew my dream was to be a magician.

## 3: Crazy Hard

Near the video camera was a big, fat book. When I looked closely, I saw it was titled Recipes, basically saying how to do a trick. I was jumping with excitement and thrill. But my excitement exploded when dad called me from downstairs, "Calen, dinner!" I thought about taking the book downstairs, but no one knew how much my dad hated bringing dusty stuff into the house better than me. The last time I had brought a poor skinny, dirty cat from the streets and my dad had threatened to kill it if I didn't get it out of the house. I ended up giving it to my best friend Alina.

That night I was so excited I couldn't sleep much. I woke up at six in the morning and got out of bed before anyone else.

I brushed my teeth and ran up to the magic room. The fat book was still on the table where I left it. I took the book and sat on the chair and started reading. The book was divided into different parts and I opened the part on the coin tricks. There were 210 of those! I read many of them. Some of them were about how to make a coin vanish and reappear, some were about how to double the value, and some were about changing

colors and many more. I was so deep into the book that I didn't realize that mom had come and was standing beside me with confused eyes until she spoke in her mild voice.

"You interested in magic? That's nice. Anyway, come downstairs for breakfast honey."

I went to breakfast obediently, scared to get a scolding from my dad. But my dad was too busy with the newspaper. "Hey dad. Good morning" I said. He scrunched up his face and narrowed his eyes. This meant no good. This meant he was not happy with me.

"What have you been doing now?"

"Nothing"

This time he raised his head out of the newspaper and said to me, "Hey there, don't you lie to me young man. I hear that you were playing around with dad's magic. That's good. Doing something creative." Unbelievable!

The next day at school I told Alina about my find and interest in magic. She is literally the most awesome girl in the world at least according to me. I expected her to laugh at me and tell to forget it but when I told her about it, her reaction was, "So cool dude! Can you bring it to school or something?" She was thrilled!

The next day I brought it to school to show Al at lunch. "It" was the coins, since I was very interested in them. She was bouncing off her seat, excited to see my magic. I had practiced hard all weekend. I showed her some of the coin tricks and her eyes were literally bulging out of their sockets in excitement. By the time lunch was done there were about a dozen people around our lunch table.

"An amazing friend, you are!" Al said that day on the bus. I loved that day. I'd never gotten so much attention in my life. I could bet I was the happiest person on Earth. The next day I again showed off my magic skills and the day after that and every day that week. I had my own fan club. Boys and girls followed me like little kids followed their parents. I felt like the king of the world. Especially because dad barely managed to put food on our plates.

We lived in a small neighborhood in the Southside of the school. Most people there didn't earn much money. We barely managed to live by. So, it was very good to have all that attention.

Then one day when all was going well, this one kid called Keller came up to me to say, "Hey Cal (Everyone called me that name) my 10th birthday's coming up and my dad's throwing a party so I wanted to ask if you could be a magician in the party?" I was stunned! Sitting at lunch in a small crowd was okay but doing tricks in a party? That was completely another story. My heart pounded in my chest and I was afraid it would come out but somehow, I managed to say, "I'll let ya know."

That night I worked on my tricks until two in the morning, when my sleepy dad came and scolded me to bed. I couldn't sleep again although I was tired. My entire body was singing a happy song.

The next day I let Keller know that I'll be the magician. His response was "We'll pay you good." I was very happy with that response because in our family money meant life. That evening I was sweating like hell. I was about to tell dad about the party. I was sure he would kill me if I told him I wanted to be a magician, but luckily, I'd asked Keller how much he would pay me, and it was about 120 bucks. So good! When I told dad that, he started acting all sweet and said he'll help me if needed. That man can do anything to make his bank account a little heavier. And so, can I.

Every night from then on, I worked hard every day and delivered my tricks with finesse. Al helped me. My friends helped me. Anything to do my best.

Twenty days later the party date arrived. I was sweating like an Eskimo in Florida. Especially in that thick black suit. That thing must weigh a ton! I arrived at the dude's house and every cell in my body was telling me to run back home, but my heart didn't agree. I walked up to the stage and all the lights fell on me. There were like a hundred people in front of me! Heart pounding in my chest I started doing my tricks. The first few of the tricks were done with a little bit of nervousness and fumbling. But then I fell into a rhythm and my tricks went out smoothly. I was so happy when the audience oohed and ahed and applauded. Then I was done and I almost cried. When Keller's dad gave me two hundred-dollar bills, I looked up at him in amazement and confusion. He just said, "You have a great talent son. Use it good." I grinned from ear to ear.

From that day on, I performed in many people's houses and earned a lot. As I became happier, I also became more confident, prouder and harsher with people. Whenever Alina and my other friends came over to help me practice, I just said, "I don't need it", and shooed them away. I didn't realize that I and my friends were growing farther apart, and my tricks were losing their finesse and glory and swiftness. Less and less people invited me to perform, but I just grew more confident and harsher.

Then came Danie's 11th birthday, one of my friends. When he asked me to perform, my first question was, "How much do I get?" He looked at me all big-eyed and stammered over words. "Y-you g-g-get about...um...90 dollars." "Will work with that."

On the day of his birthday, I wasn't nervous at all. I hadn't practiced at all, but I told myself I didn't need it. But my hands had other plans. I failed on every trick, even the easy ones. Someone cursed at me and slowly the audience started filling out. Someone said I should give all this up and polish shoes. I was embarrassed from head to toe. At the end of the awful show Danie came to, red eyed, slapped me across the face and gave me a wrinkled ten saying, "That's all you deserve."

That night I screamed and cried and screamed until I couldn't do even that anymore. I felt like an awful person. Someone who doesn't care about his talents or anyone else. Who is very selfish and self-absorbed? I felt like I was no one. Hearing the noise mom and dad ran up the stairs and I cried in their shoulders and fell asleep.

The next morning, I woke up at ten and went downstairs for breakfast still sad from last night's events. When I sat down Dad started talking. "Danie came over this morning. He told us everything." I kept eating. "It'll be okay son." I kept eating. "Please tell us if you need anything." I kept eating. Finally, dad gave up trying to make a conversation. After I was done eating, I went to the garage and took my bike and went to Al's house. I didn't think about anything the entire ride, I felt like a robot. An idiotic robot.

When Al opened the door, she looked surprised to see me. I just hugged her and cried my eyes out. She tried to calm me down, but I could hear soft sobbing on the back of my ear. When we broke apart, I saw her eyes were red and she looked like she hasn't slept in days. "I'm sorry." I said. She just looked at me and said nothing. "I really am sorry." I said again. She said, "It's not your fault. It's mine. I wasn't there to help you." I hugged her tighter than ever before and said sorry a thousand times before I felt okay. Then I used her cell to call all my friends, especially Danie and said sorry and told them to come over.

When they did (I was afraid they won't.) I said sorry once again. After a long time, we had a good time, everyone together, a friends' day out. I was so very happy.

But I lost all my attention in school. Danie had invited most kids in our grade and everyone knew about the incident and bad show. So, everyone looked at me like I was a bug who had crawled out of a drain. But there was one girl who didn't look at me like that. Her name was Sana. I knew her from one of my classes.

At lunch that day she asked me if I could perform at her mom and dad's anniversary. I was dumbstruck! After all the drama, she was asking me to perform. I said yes, obviously. The anniversary was one month away. So,



I worked hard every night and this time my parents didn't tell me anything, in fact they supported me. My friends helped me a lot. I was happy to be myself again.

Thirty days later. I was sweating even though it was sixty degrees. I went up the stage and started fumbling with my coins, panicking. But Al had taught me to deep breathe so I did, and it helped. Then just like my first performance ever I fell into a rhythm. And everything went smoothly. As expected!

## EPILOGUE

I'm 20 years old now and perform in hotels and events and other places. Famous guy. I don't have to worry about food getting on my plate because it does, every day. And not barely, easily in fact. I live in a mansion with my parents now, not in the small-town neighborhood. One thing for sure, I've learned in my magical career that practice is very important. Very important.



# Durga Pujo

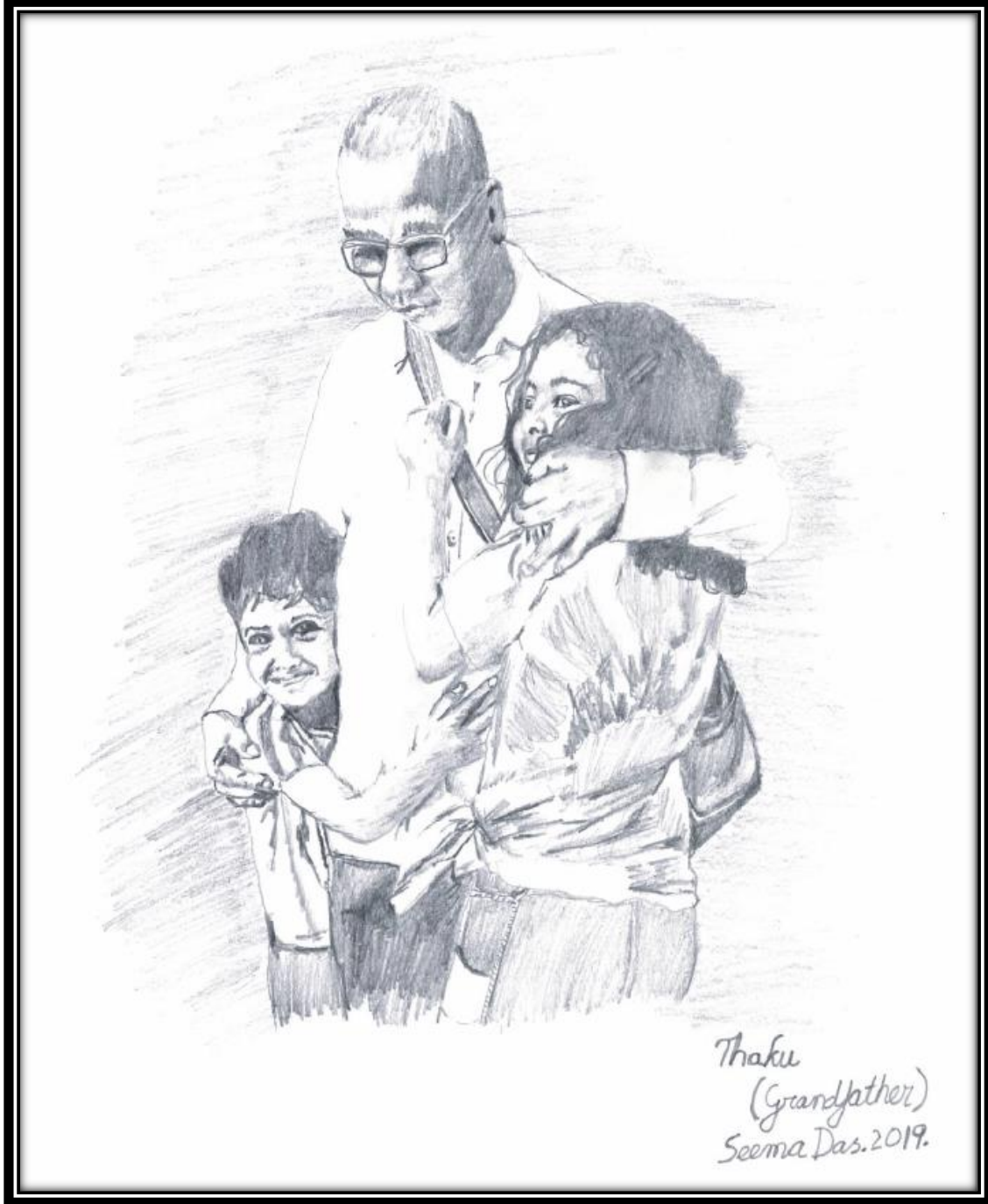
*Ms. Rajanya Bishi (Age: 9 years)*

The blue clouds move, the wind blows  
Something far away, somewhere we do not know!  
Happiness scares away the doom,  
While "Shiulis" happily bloom!  
Close of summer and bring in autumn,  
Listen to the joy of dancing beats – dum, da-da, dum!

Can't wait for the time to pass,  
Maa Durga you come in the "Ashwin mash";  
O Maa Durga, up above you is the Lord Shiva,  
And, down below is the cruel Ashura;  
You are everyone's mother, the goddess of power,  
We pray to you with both hands folded together,  
For good health, peace and happiness forever!

Durga Maa you stay with us for four days,  
We celebrate those in fun ways;  
These four days are filled with glee,  
The "Sasthi", "Saptami", "Ashtami" and "Nabami"!  
We worship you forever,  
And wish you could stay a little longer;  
When you leave us on "Bijoya Dashami",  
We will wait for another year eagerly!

# সীমা দাস



# মধুমন্তী রায় বর্মণ



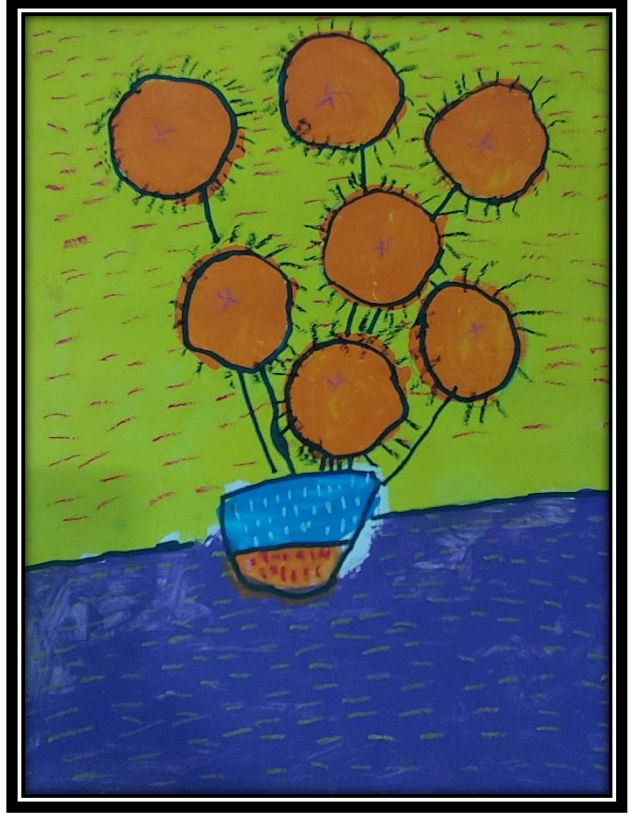


# অমিতাভ চৌধুরী





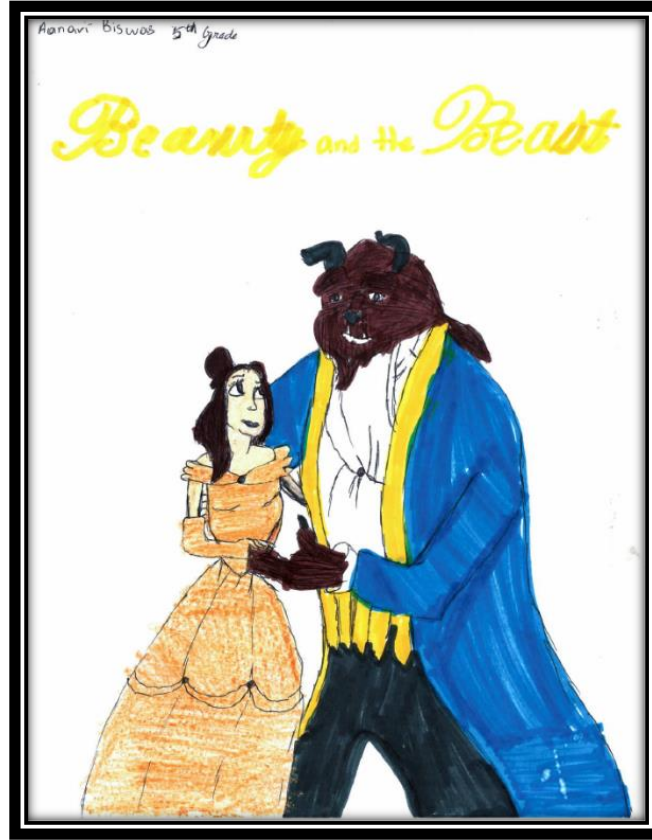
# রিয়ানা সেনগুপ্ত



# শৌর্য ভট্টাচার্য



# অনাভি বিশ্বাস



# সুমিত চক্রবর্তী





# অনহিতা চৌধুরী



# উপাসনা রায়

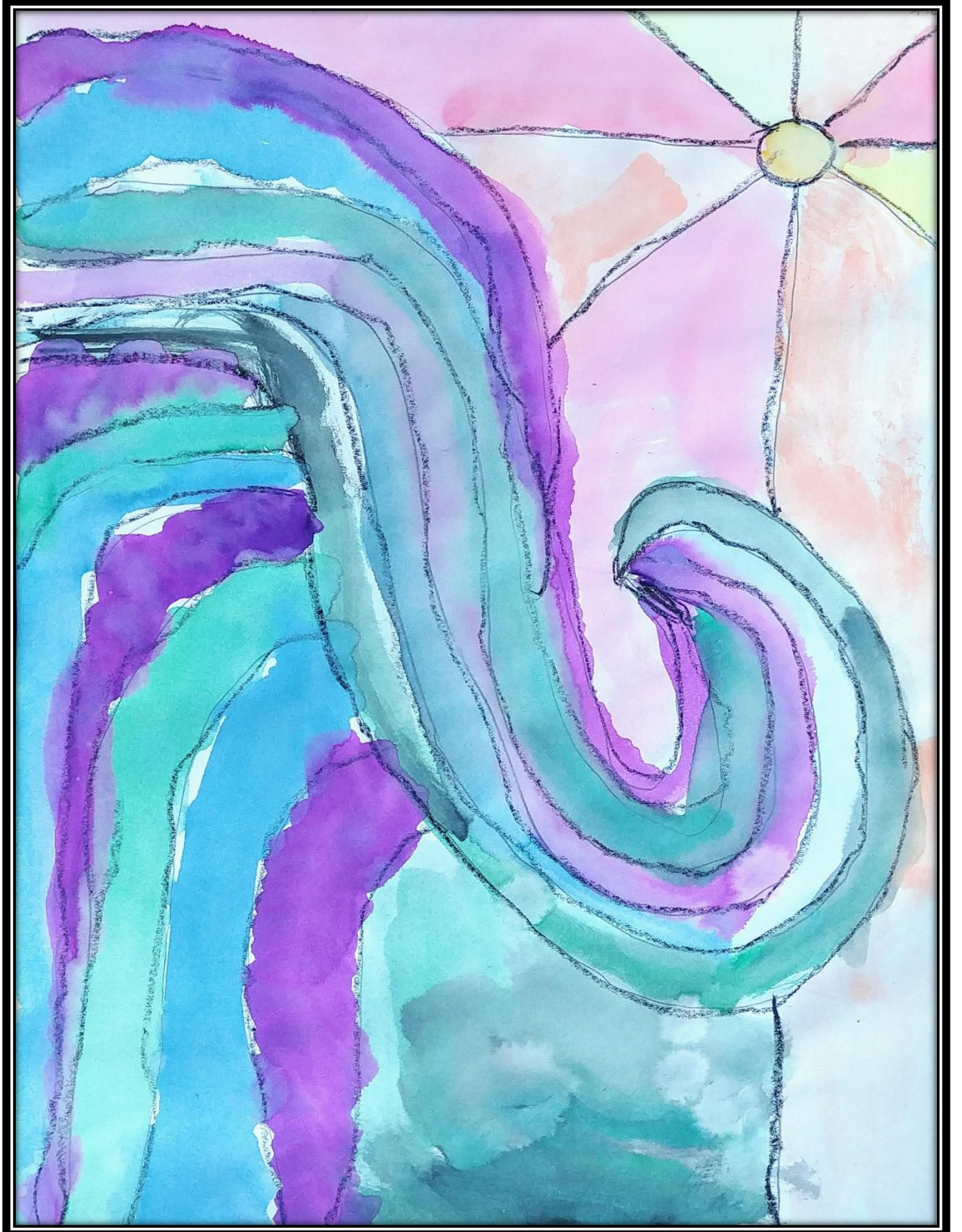


# আঁখি তালুকদার





# আৰ্যব মুখার্জী





# আর্যভ দাস



# রোহন ঘোষ

আহার বিয় খাবার



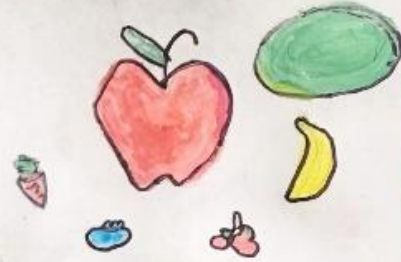
লেমনি



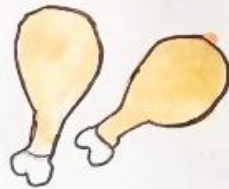
পেঁপে



নিংড়া



ফল



মাংস



পুজি

রোহন ঘোষ

২০২১



# আৰ্য ঘোষ

আমাৰ প্ৰিয় বই

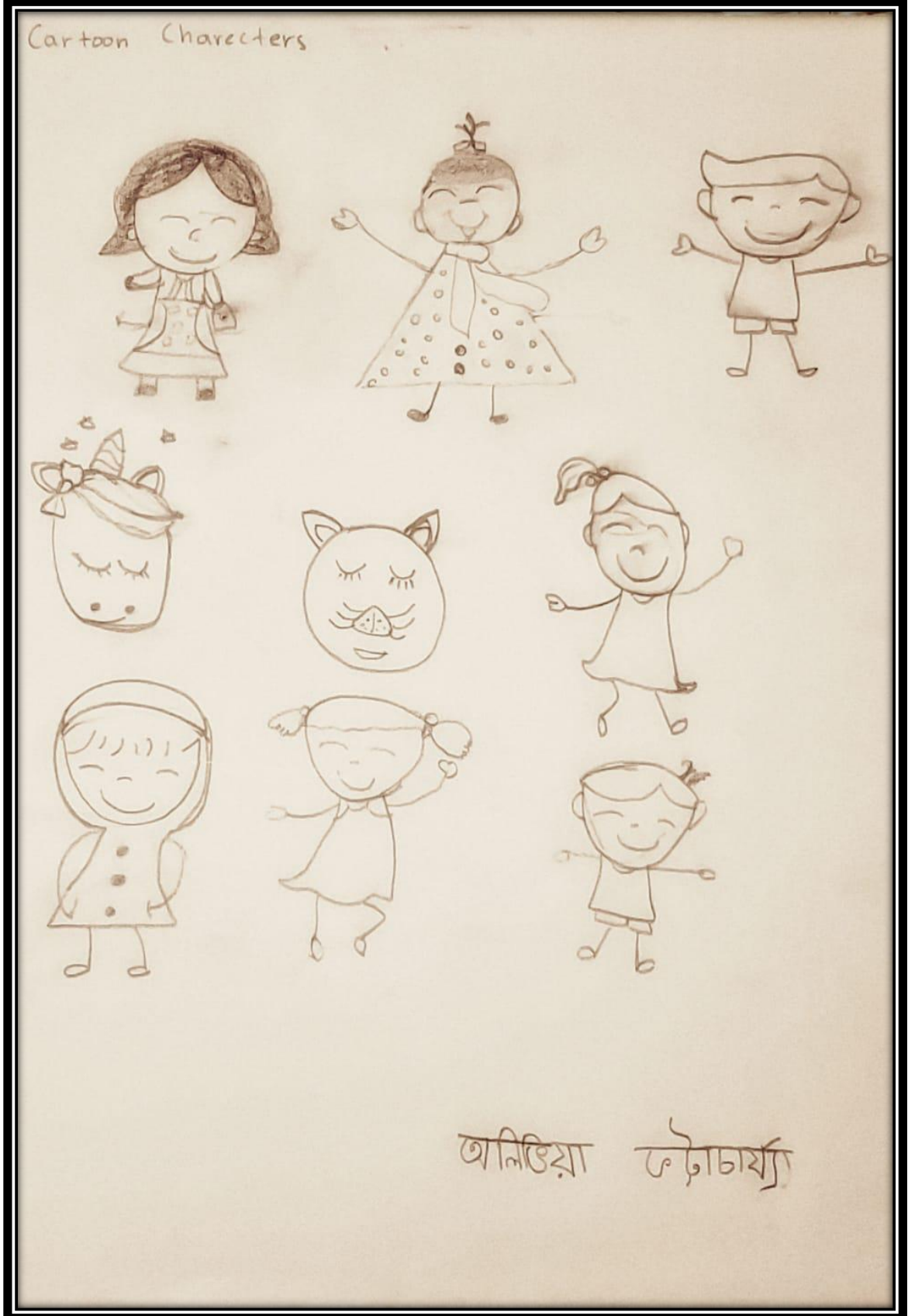


গাৰখিন্দু

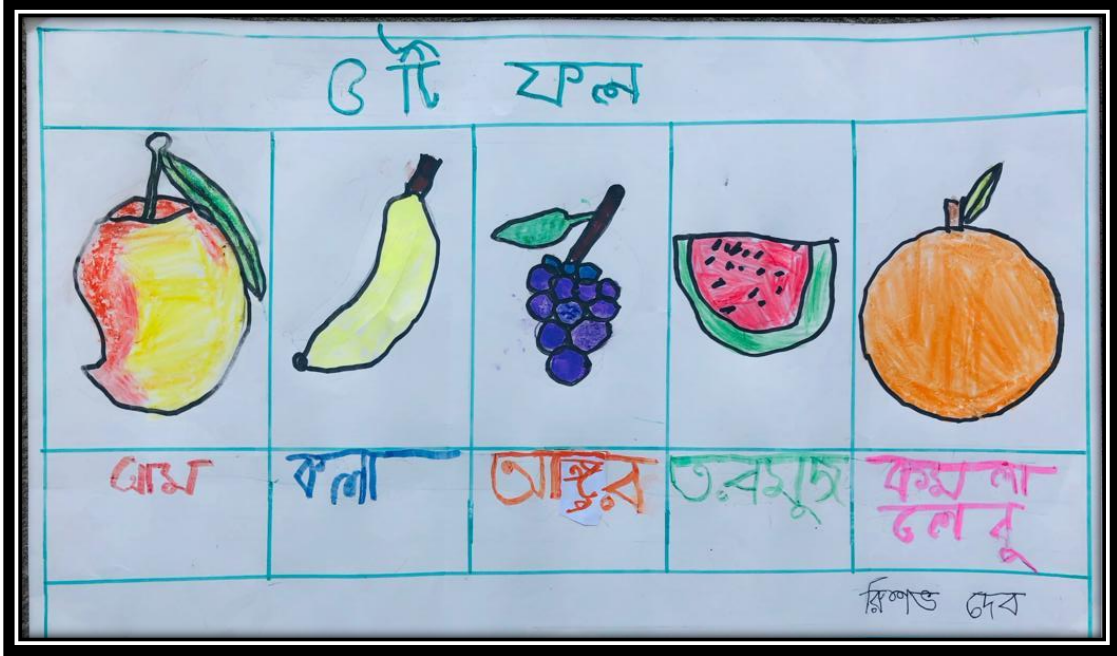
গাৰখিন্দু নিজেৰে ডিম ডেডিম,  
গাৰখিন্দু একটা ভীষন মোটা ব্ৰহ্মা,  
সে জন বনে একটা লোকৰ কাছ  
মাৰ্কে, সে খুব দুইখি কৰে,  
আৰিয়ান 'ঘোষ,



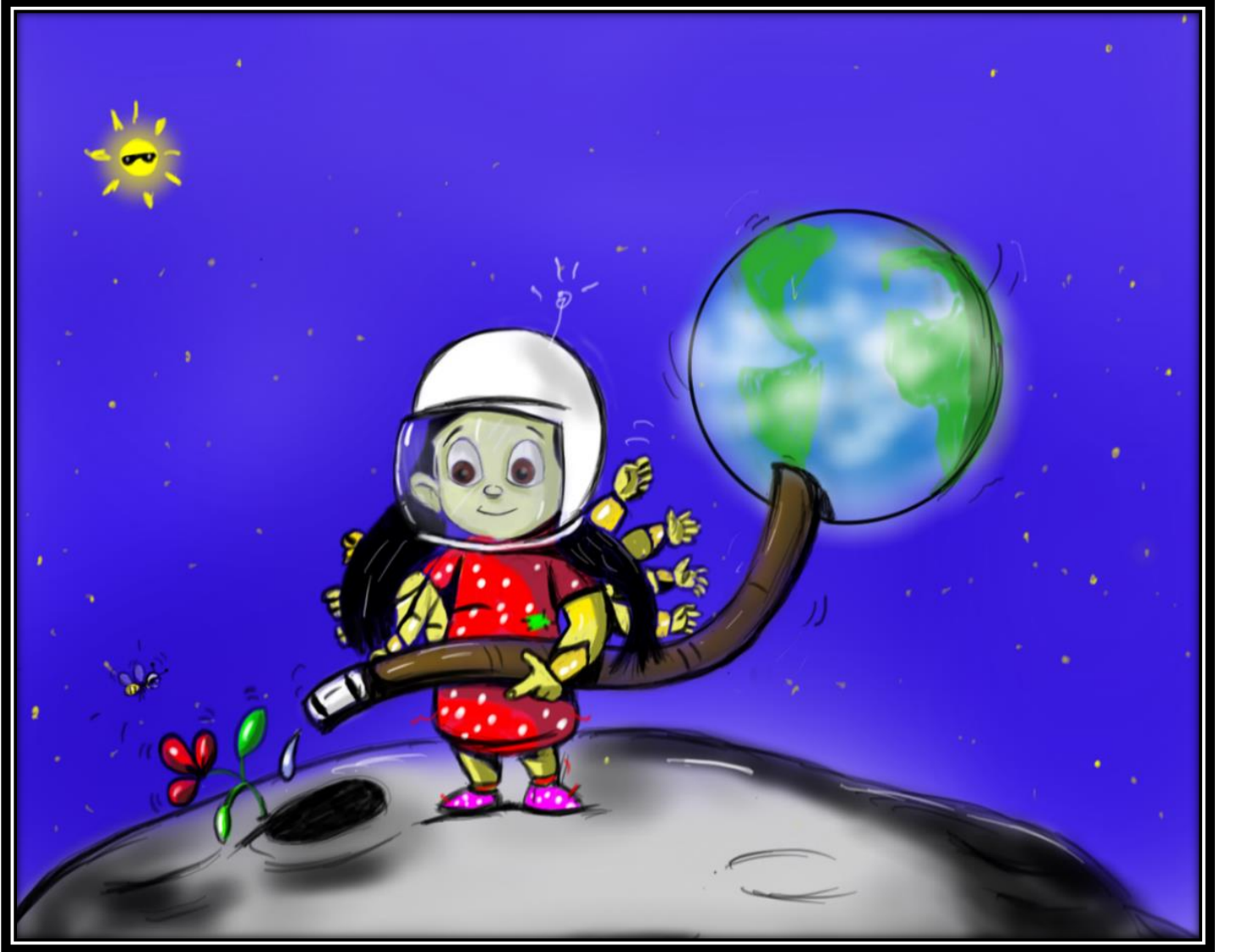
# অনিভিয়া ভট্টাচার্য



# ঋষভ দেব



# শুভজিৎ ব্যানার্জী





## He came, he saw, he conquered!

*Taniya Talukdar*

***Intro: Somen Debnath, who's traveling the world spreading AIDS/HIV awareness and promoting Indian culture on a bicycle, made a pit stop in Cleveland this past April***

We had already read a lot about him on the internet by the time Somen Debnath arrived in Cleveland one spring evening. Following his journey over the last few years, a few of the BCS Executive Committee members were brimming with excitement to finally meet this interesting traveler of the world in the flesh. Most of us had many curious questions that only Somen could answer and answer he did.

The members of the EC met up at the current President, Mitali Das Singh's house over dinner for a meet and greet session with Somen. He seemed to be very comfortable among the unknown crowd and pretty soon had everyone warm up to him over his stories and conversation.

It wasn't just his wish to spread awareness about AIDS/HIV throughout the world, but also to see the world a little differently that Somen started his bicycle ride that took him to 150 countries so far.

When asked about what made him take up this daunting journey: "There were three things that were instrumental in my quest," said Somen, going on to state the three factors: "The first was this newspaper article I read at the age of 14 about a man suffering from AIDS who was abandoned by his family and died near the gate of a medical college unattended.

The second inspiration was provided by Swami Vivekakanda's book - Amar Bharat Amor Bharat - where he says that to see the world you need to travel through India and to see India you have to travel the world. The third and last inspiration came from the book Du Chakay Duniya - a book by Bimal Mukherjee, who was the first Indian globetrotter who travel the world in a bicycle from 1926-1937."

Somen kicked-off his bicycle tour in 2004 and by the time he reached Cleveland, he had already touched the lives of millions of people. Having spent nights in unrelenting weather and situations, only his relaxed and unsuspecting nature, coupled with the 'nothing-to-lose' attitude kept him focused on his mission. When asked what made him stay so calm in untoward situations, Somen replied: "Yoga keeps me going. I practice yoga regularly to stay focused."

If he met good people who helped me with food and shelter, there were also people who robbed him of his bicycle and belongings. But that didn't shake Somen's faith in humanity because whenever he sought help, he found it even in the face of adversity. "I was beaten up many times, I was robbed many times, I was even kidnapped at one point of time," he informed us with a smile and added, "Every time such an incident happened, I would explain my mission to the adversaries." Most times he was able to get away because of his resilient nature and compromising attitude.

"I have learnt to compromise and not judge people, humanity exists everywhere even in a robber." said Somen about the biggest lesson learnt through his journey. "Even though I faced so many problems, I never

thought of giving up because I always found help.” he explains.

He packs his entire life in just 5 bags and carries them around the world on his bicycle, “Its my mobile home,” he said and elaborated, “one bag contains my clothes, the other has my sleeping essentials like a sleeping bag, tent, blanket etc, the others has my computer, a hard disk that houses all my pictures taken along the way, books and a few diaries are kept in one of the bags and the other one holds my important travel documents. Most often people call me a nomad but that’s the life I have developed in the last decade or so and I am happy with it.”

Apart from the meet and greet session, BCS also hosted a fundraising evening for Somen. It was attended by a lot of people and we were able to raise a considerable amount of money. Answering a question from the audience about his travel in the US, Somen says, “I was always very scared to travel to the US for unexplainable reasons but now that I am here, I have received so much love from people that I am overwhelmed. So far I have traveled 21 states here and the experience has been amazing.”

Being a Bengali from Kolkata, he found support and help not only from the different Bengali associations of the world, but also people from other communities. In fact, he was hosted by the Prime Minister of Iceland and was also made a part of a 7 day AIDS workshop where he got to spread awareness among the lesser privileged people.

Wherever he went, Somen managed to create an everlasting relationship with many, and Cleveland was no exception. Our Mitalidi, who hosted him for the 3-4 days that Somen was here said, “He has almost become like a family member to us now. He keeps in touch and calls us regularly. His simple and down-to-earth nature attracts people to him. He’s very well-mannered and friendly.”

Having traveled to places like North Pole, Alaska, Antarctica and the likes with extreme temperatures, Somen has developed strong resistant power which he credits to the practice of yoga.

Also, whenever he has traveled to such places, not every time was he able to ride his bicycle due to bad terrain and weather conditions. What did he do in such situations? “I took a flight using the money I raised on the way,” answers Somen.

While he did not really feel homesick in his travel owing to his thinking of the world being his family, the one time that he might’ve wanted to be back home was perhaps when his father passed away. Talking about it he said, “My father wasn’t too keen about me going on this adventure but my mother helped me convince him. Unfortunately, I couldn’t meet him again. His death was the only one time during the last 15 years that I went back home to Kolkata for a week to fulfill the duties of the older son.”

Paper maps graduated to Google maps, letters developed to emails and physical catching up moved into social media while Somen has been on the road. But nothing and no one could stop him from carrying on his expedition that started with travel within India and then moved over the border. He looks forward to end his journey in 2020 and start his long dream of a global village back in India.



*Proud to support the BCS Community. Enjoy the festival!*

**Buying...Selling... or Refinancing Your Home?**  
**Call the people you know to handle your title & escrow needs!**



**Dale D. Kolesar**  
Co-Owner



**“Service to the Max”**  
**(440) 801-5000**

[www.maximumtitle.net](http://www.maximumtitle.net)



**Leo W. Oblak**  
Co-Owner

**22021 Brookpark Road #124 · Fairview Park 44126**





# RUMI'S Market & Deli

Asian-Indian Super Market in Cleveland

8225 Carnegie Ave., Cleveland, OH 44103 216-229-7864

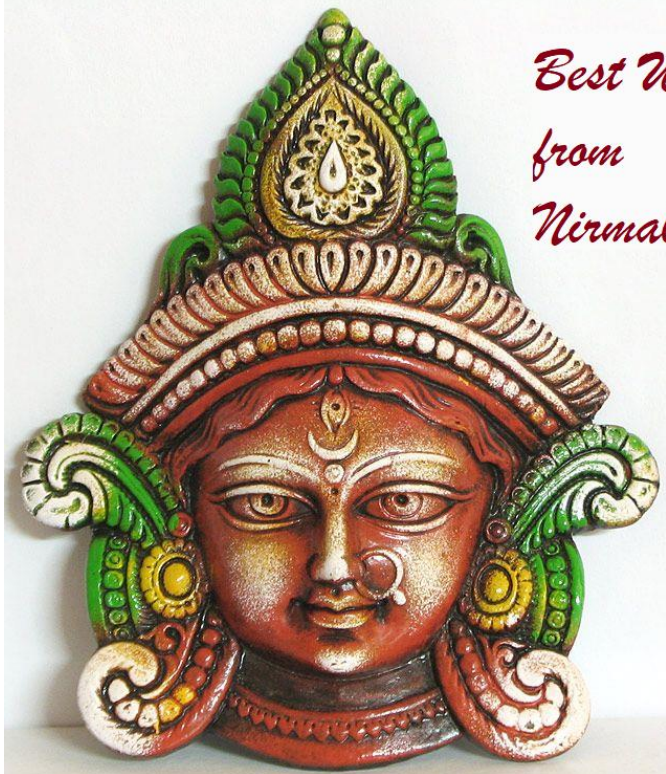
Conveniently located in proximity to Cleveland Clinic, Case Western University and Cleveland State University, Cleveland Heights and Downtown Cleveland

Low-Price, High-Quality Indian Groceries, vegetables and more

At Rumi's Market, we carry a wide selection of Indian-Pakistani groceries with ethnic produce & fresh meats at affordable prices.



We carry Hilsa, Rohu, Goat Meat and many other Bengali Groceries.



*Best Wishes*

*from*

*Nirmal, Sunanda Kundu & Family*

শারদীয় অভিনন্দন



সুজিত, বৈশাখী, সুরঞ্জিত, সঞ্জনা

**TATA  
CONSULTANCY  
SERVICES**





— *জয়দীপ শুভেচ্ছা* —

জয়দীপ, অম্বালিকা, পিয়াল দাসগুপ্ত, কোয়েল ও গাভান লকহাট

## PUJA GREETINGS AND BEST WISHES



*From....*

*Mou, Abhi, Nia, John, Laddu, Anuradha and Niloy Bhadra*



আনন্দময়ীর আগমনে সবার  
অন্তর আনন্দে ভরে উঠুক



কুমকুম মুখার্জী, আলাপ, সৃষ্টি, শুভশ্রী, প্রবর ও প্রতিমা ঘোষ

**Bijoya Greetings and Best Wishes**



*From.....*

*Pratyay, Anuraag, Priya, Pallab, Sanker  
and Anima Raman*

WITH BEST WISHES AND PUJA GREETINGS



*Amit, Arindam,  
Sharmila and Jyoti Chakraverty*



*Renal Consultants Inc. of Canton  
Wishes each and everyone a  
Happy Durga and Laxmi Puja*



*Dr A. Maitra    Dr A. Kontamwar    Dr. N. Pradhan  
Specialists in Kidney Diseases and Hypertension*



সৌম্যজিৎ মন্ডল, অভিনন্দা মুখার্জী  
ও  
আনন্দ মন্ডল

Christine E. Fuller, EA

Tax Advisor, Certifying Acceptance Agent

Chagrin Plaza East  
23811 Chagrin Blvd Ste 340  
Beachwood, OH 44122

Office : 216.464.7212 | Fax : 216.464.2827  
christine.fuller@blockadvisors.com

BLOCKADVISORS.COM

**BLOCK**  
**Advisors**  
Tax Preparation





# FIFTH THIRD BANK

**Nate Cline  
Paul J Pfister  
Scott Malafarina**

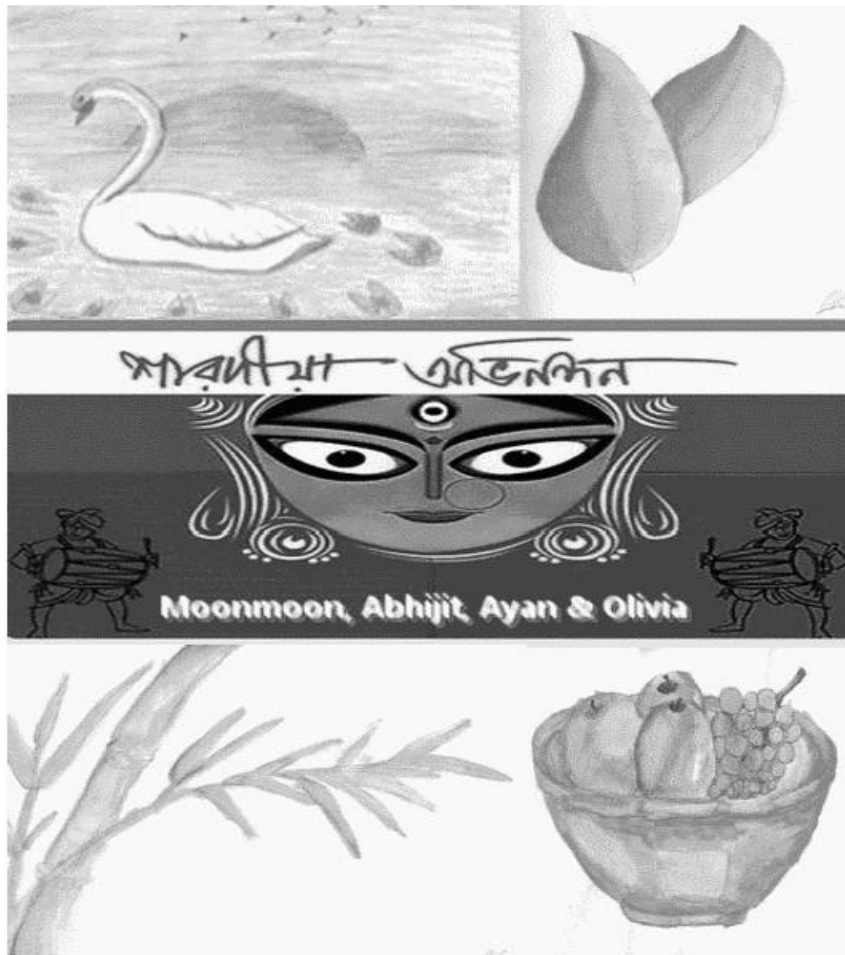
Solon Financial Center  
6445 Som Center Road  
Solon OH 44139

440.248.1850  
[www.53.com](http://www.53.com)

# BIJOYA GREETINGS



From  
Ramen, Bharati, Neal and Ronit Majumdar



# *Best wishes & Bijoya Greetings*



*From Our Family  
BAIKUNTHA, RATNA  
KOUSHIK, MALA, ASHNA  
PARTHA, RIMI, PRISHA*



"Your Source For Packaging, Shipping & Safety Supplies"

## WE'RE HIRING

Here at Wrap Tite we collaborate, support each other and strive to improve. Our associates take tremendous pride in their chosen professions, the quality products we create and sell and the positive difference our company makes. Wrap Tite is a growing, stable employer with many career opportunities available. If you see yourself thriving in our culture, we want to talk to you.

### WRAP TITE BENEFITS

- 401K after a year
- Health benefits after 90 days
- PTO starting after 90 days
- Room for company advancement
- Team work environment
- Tuition Reimbursement

At Wrap Tite, we are more than a workplace, We Are Family.  
We hold ourselves to the highest standards, to do this we need top performers.



To view open positions or apply, visit [www.wraptite.com/careers.html](http://www.wraptite.com/careers.html)  
Or stop in 6200 Cochran Rd. Solon, OH 44139 between 9a.m and 3p.m



*Best Wishes and Puja Greetings*



**Asoke, Madhumita,  
Anushka and Ahana Dey**



*Bijoya Greetings*

From

Suman, Soma & Sumeet

শারদ মন্বাষন



উৎপল, অ্যান্থনী শু উষসী দত্ত



**Muktadhara Inc.**

37-69 74th ST, 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372, E-mail: [muktadharainc@gmail.com](mailto:muktadharainc@gmail.com)

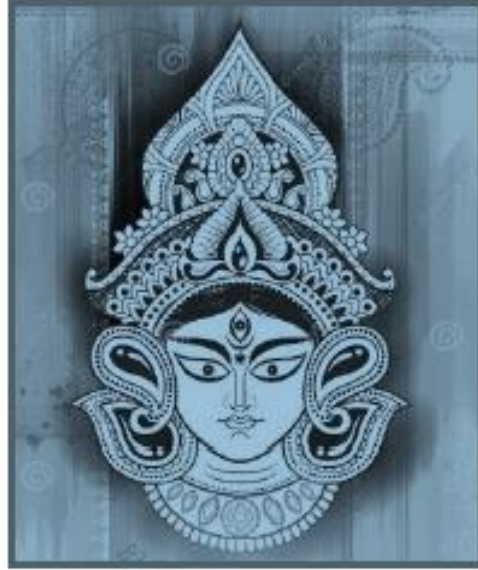
**Tel: 718-565-7258, 347-656-5106**

Best Wishes and Puja Greetings



TATINI AND SANCHITA MAL SARKAR

সবাইকে শারদীয় অভিনন্দন



সৌমিত্র, মুক্তা, সোহন ও শালীন



**May Ma Durgā Bring All Happiness To You  
And Your Family**

শুভ বিজয়া



শুভ বিজয়া

**SOMA, SUBHRA, SANHITA, AND SADHAN JANA  
FAIRLAWN, OH**



## Puja Greetings & Best Wishes



*From.....*

*Deeya, Prithviraj, Babita and Dhurjati Basu*

Puja Greetings & Best Wishes

From

*Julie-Anne, Monica,*

*Kathy & Anjan Ghose*

Puja Greetings



RISHAN, DEBJANI, DEBORSHI, BAISHAKHI,  
INDRANI, ISHA & DIPTI PROKASH ROY

## Cleveland's BEST FISH Market

Fresh Shrimp

Fresh Buffalo

Fresh Shad

All fish dressed to order at  
NO EXTRA CHARGE

*We also carry Goat & Lamb meat*

## FARM HOUSE FOOD DISTRIBUTORS

2 LOCATIONS

9000 Woodland Avenue (216)791-6948

20524 Southgate Park Blvd. (216)587-6767



“বৰিষ ধৰা মাঝে শান্তিৰ বারি”  
সকলকে আমাদেৰ শুভেচ্ছা জানাই



**Nitis, Chandana, Richik, Andrea,  
Prateek Sarkar , Adrienne Day,  
Diyamoni Sarkar, Harry and Otis**

সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই

নবীন সাহানা শ্ৰীদীপ মেলনী নীলাঞ্জন

অৰ্জুন ও মায়ী

Seasons Greetings to the Community



**Jayanta,  
Jean & Jagannath Das**

# Cafe Tandoor

*Award Winning Indian Cuisine*

96 Barrington Town Center

Aurora, OH 44202

330-562-5334

## *Lunch*

*Tuesday - Saturday 11:30-2:00*

## *Dinner*

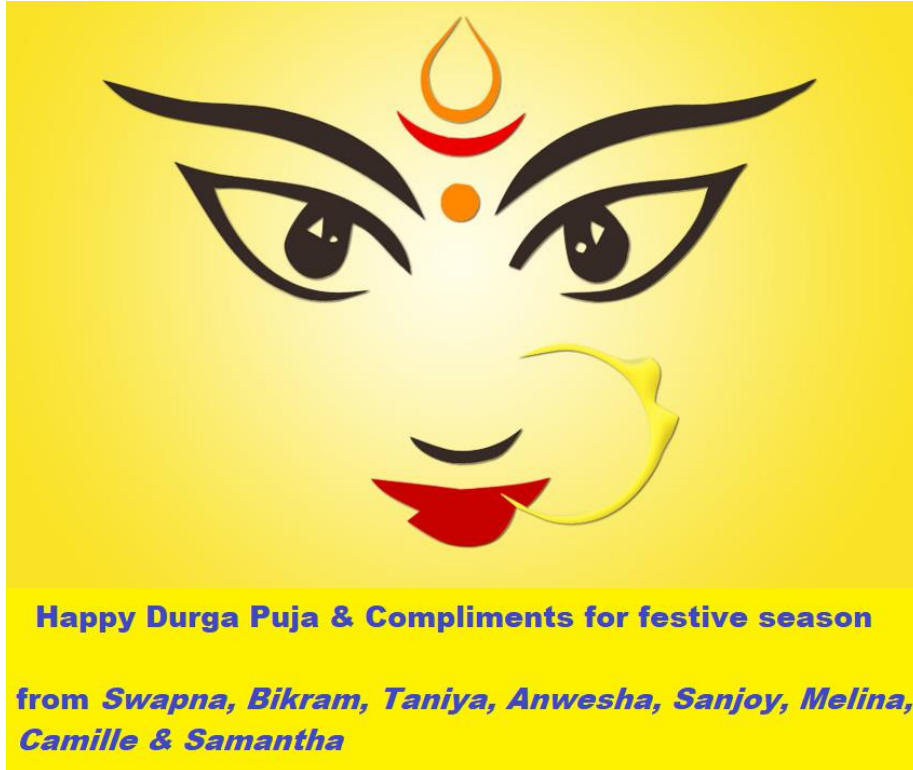
*Monday - Saturday 5:30-10:00*

*Sunday 3:00-9:00*

ধর্ম য়ার য়ার  
উৎসব সবার



অনেকানেক শুভেচ্ছা  
শায়লা . তিতাস . জুনায়েদ . জুবার



**Happy Durga Puja & Compliments for festive season**

**from Swapna, Bikram, Taniya, Anwasha, Sanjoy, Melina,  
Camille & Samantha**





শারদীয়া শুভেচ্ছা

- পার্থ, রানী, অনিকেত ও অয়না



শুভ শারদীয়া



*Wish you all a HAPPY BIJOYA*

*Monika , Anika , Aaditya and Deep Samanta*